



বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের অধীনে

এইচএসসি বিএমটি দ্বাদশ শ্রেণির (২য় বর্ষ) ২০২৪ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য

মার্কেটিং নীতি ও প্রয়োগ-২ সুপার সাজেশন

শর্ট সিলেবাস

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে এইচএসসি (বিএমটি) পরীক্ষা ২০২৪-এর পুনর্বিন্যাসকৃত পাঠ্যসূচিঃ
শিক্ষাক্রমঃ এইচএসসি (বিএমটি) শ্রেণিঃ দ্বাদশ বিষয়ঃ মার্কেটিং নীতি ও প্রয়োগ-২ বিষয় কোড-২১৮২৮
তথ্যীয়ঃ খাঃমুঃ ৪০ চঃমুঃ ৬০

অধ্যায় ও শিরোনাম	বিষয়বস্তু (পাঠ ও পাঠের শিরোনাম)	পরিমিত সংখ্যা (তাত্ত্বিক)
অধ্যায়-১ : উৎপাদনের ধারণা (Concepts of Production)	ক. উৎপাদনের ধারণা, গুরুত্ব ও আওতা। খ. উৎপাদনের উপকরণ- ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন। • ভূমির ধারণা, বৈশিষ্ট্য। • শ্রমের ধারণা ও শ্রম বিভাগের সুবিধা-অসুবিধা। • মূলধনের ধারণা, গুরুত্ব। • সংগঠনের ধারণা, বৈশিষ্ট্য শ্রেণিবিভাগ।	৪
অধ্যায়-২ : উৎপাদনের মাত্রা (Scale of Production)	ক. উৎপাদনের মাত্রার ধারণা ও গুরুত্ব। খ. মাত্রাজনিত ব্যয় সংকোচ ধারণা। গ. ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজ: সুবিধা-অসুবিধা। ঘ. বৃহদায়তন এন্টারপ্রাইজ: সুবিধা-অসুবিধা।	৪
অধ্যায়-৩ : পণ্য ডিজাইন ও উন্নয়ন (Product Design & Development)	ক. পণ্য ডিজাইন ও উন্নয়নের ধারণা, গুরুত্ব। খ. নতুন পণ্য উন্নয়ন প্রক্রিয়া। গ. এসেমবলিং (Assembling), কাস্টমাইজেশন (Customization) ঘ. নতুন পণ্য উন্নয়নে বিবেচ্য বিষয়সমূহ। চ. পণ্য মান নিয়ন্ত্রন বিএসটিআই ও আইএসও এর ভূমিকা।	৪
অধ্যায়-৪ : ব্যবসায়ের অবস্থান (Location of Business)	ক. ব্যবসায় অবস্থানের ধারণা ও সুবিধা-অসুবিধা। খ. ব্যবসায় অবস্থানের উপর প্রভাববিস্তারকারী উপাদানসমূহ।	৩
অধ্যায়-৫ : বিজ্ঞাপন (Advertising)	ক. বিজ্ঞাপনের ধারণা। খ. বিজ্ঞাপন মাধ্যমের প্রকারভেদ। গ. বিজ্ঞাপন মাধ্যম নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়সমূহ।	৩
অধ্যায়-৬ : ব্যক্তিগত বিক্রয় (personal Selling)	ক. ব্যক্তিগত বিক্রয়ের ধারণা ও গুরুত্ব। খ. আদর্শ বিক্রয় কর্মীর গুণাবলী। ঘ. বাংলাদেশ ব্যক্তিগত বিক্রয় পেশার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ।	৩
অধ্যায়-৭ : বিক্রয় প্রসার (Sales Promotion)	ক. বিক্রয় প্রসারের ধারণা ও পদ্ধতিসমূহ। খ. বাংলাদেশে বহুল ব্যবহৃত ও জনপ্রিয় বিক্রয় প্রসার কৌশলসমূহ।	৩
অধ্যায়-৮ : গণসংযোগ (Public Relations)	ক. গণসংযোগের ধারণা ও গুরুত্ব। খ. গণসংযোগের হাতিয়ারসমূহ। গ. বাংলাদেশে গণসংযোগ পেশার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ।	৩
অধ্যায়-৯ : প্রত্যক্ষ মার্কেটিং (Direct Marketing)	ক. প্রত্যক্ষ মার্কেটিং এর ধারণা। গ. প্রত্যক্ষ মার্কেটিং এর সুবিধা-অসুবিধা।	২
অধ্যায়-১০ : মার্কেটিং প্ল্যান (Marketing Plan)	ক. মার্কেটিং প্লানের ধারণা ও গুরুত্ব। খ. মার্কেটিং প্ল্যান টেমপ্লেটের ধারণা। গ. মার্কেটিং প্ল্যান টেমপ্লেটের বিষয়বস্তু-সারসংক্ষেপ, ব্যবসায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পণ্য/সেবার বর্ণনা, মার্কেটিং পরিকল্পনা।	৪
মোট		৩৩

অধ্যায়-০১: উৎপাদনের ধারণা

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর

১। উৎপাদনের ধারণা দাও।

উত্তর: মানুষ তার শ্রম ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে প্রাকৃতিক সম্পদে যে বিনিময়যোগ্য বাড়তি উপযোগ সৃষ্টি করে তাকে উৎপাদন বলে। সাধারণতঃ উৎপাদন বলতে কোনো দ্রব্য সৃষ্টি করা বুঝায়। কিন্তু অর্থনীতিতে উৎপাদন শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। উৎপাদন বলতে অর্থনীতিতে উপযোগ সৃষ্টি বুঝায়। বস্তুতঃ মানুষ কোনো পদার্থ সৃষ্টি করতে পারেনা, ধ্বংসও করতে পারে না। মানুষ শুধু প্রকৃতি প্রদত্ত কোনো বস্তু বা পদার্থের রূপান্তর বা আকারগত পরিবর্তন ঘটিয়ে উপযোগ সৃষ্টি বা বৃদ্ধি করতে পারে।

আর. আর. মেয়ার্স-এর মতে, উৎপাদন হচ্ছে এমন কাজ সম্পাদন করা, যার উপযোগ আছে।”

হেইজার এবং রেভার-এর মতে, “পণ্য বা সেবা তৈরি করাই উৎপাদন।”

ই.এস বাফার-এর মতে, “উৎপাদন হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন করা হয়।”

পরিশেষে বলা যায় যে, মানুষ কোন বস্তুর আকৃতিগত পরিবর্তন, স্থানান্তর, প্রচার ইত্যাদির মাধ্যমে এতে বাড়তি উপযোগ সৃষ্টি করে আর এই বাড়তি উপযোগ মূল্য সৃষ্টির কাজই উৎপাদন হিসেবে বিবেচিত হয়।

২। ভূমির সংজ্ঞা দাও।

উত্তর: ভূমি হলো উৎপাদনের প্রথম ও মৌলিক উপাদান। সাধারণ ভাষায়, ভূমি বলতে ভূ-পৃষ্ঠকে বুঝায়। কিন্তু অর্থনীতিতে এটা বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়। অর্থনীতিতে কেবল পৃথিবীর উপরিভাগকে ভূমি বলা হয় না। অর্থনীতিতে ভূমি বলতে প্রকৃতির অব্যবহৃত দান সকল সম্পদকেই বুঝায়। মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে ভূমি অত্যাবশ্যক।

নিচে ভূমির প্রামাণ্য সংজ্ঞা তুলে ধরা হলো:

আলফ্রেড মার্শাল-এর মতে, “ভূমি বলতে জলে-স্থলে, আলো-বাতাসে এবং উত্তাপে পরিব্যাপ্ত সেসব পদার্থ ও শক্তিকে বুঝায়, যা মানুষের সাহায্যের জন্য প্রকৃতি মুক্তভাবে দান করেছে।”

অ্যামোস-এর মতে, “ভূমি হলো এমন একটি প্রাকৃতিক সম্পদ, যা দ্রব্য বা সেবা, খনিজ সম্পদ, মাটির পুষ্টির পদার্থ, পানি, বন্যপ্রাণি, ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগে গাছপালার বর্ধনশীল প্রক্রিয়া।”

সুতরাং বলা যায় যে, প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদগুলো যখন বিনিময় মূল্য দ্বারা নির্ধারিত হয় বা যা উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয়, তা ভূমি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

৩। শ্রম কি?

উত্তর: সাধারণ অর্থে, শ্রম বলতে মানুষের কায়িক পরিশ্রমকে বুঝায়। কিন্তু শ্রম শব্দটির বিশেষ ও ব্যাপক অর্থ রয়েছে। উৎপাদন কাজে নিয়োজিত সকল প্রকার শারীরিক ও মানসিক কাজ ও সেবাকর্ম এবং যারা বিনিময়ে পারিশ্রমিক পাওয়া যায়, তাকে শ্রম বলে। বস্তুত মানুষ পরিশ্রমের বিনিময়ে যা কিছু অর্জন করে তাকে শ্রম বলে।

অধ্যাপক মার্শালের মতে, “মানসিক বা শারীরিক যেকোন প্রকার পরিশ্রম বা আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে আনন্দ ছাড়া অন্য কোন উপকারের নিমিত্তে করা হয়, তাই শ্রম।”

৪। মূলধন কাকে বলে?

উত্তর: অর্থনীতিতে মূলধন বলতে মানুষের শ্রমের দ্বারা উৎপাদিত সম্পদের সেই অংশকেই বোঝায় যা পুনরায় উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয়। ব্যবসায়ে নিয়োজিত প্রয়োজনীয় উপকরণই হলো মূলধন। মূলধন হতে হলে তা অবশ্যই মানুষের কর্তৃক সৃষ্ট হতে হবে এবং ভবিষ্যৎ উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হতে হবে। তাই মূলধনকে উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান বলা হয়। সুতরাং, যেসব দ্রব্য মানুষের শ্রম দ্বারা উৎপাদিত এবং বর্তমান ভোগের জন্য ব্যবহৃত না হয়ে অধিকতর উৎপাদনের জন্য পুনরায় উৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত হয় তাই মূলধন হিসেবে বিবেচিত হয়।

নিচে মূলধনের কিছু প্রামাণ্য সংজ্ঞা তুলে ধরা হলো:-

মি বয়ার্কের মতে, “মূলধন হলো উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান।”

অধ্যাপক জে.এফ.সিল-এর মতে, “মূলধন হলো ভবিষ্যৎ সম্পদ উৎপাদনের জন্য অতীত শ্রমের সংগৃহীত উপাদান।”

এডাম স্মিথ-এর মতে, “যে সম্পদ হতে কিছু আয় করা যায়, তাই মূলধন।”

পরিশেষে বলা যায় যে, মানুষ ব্যবসায়ে যেসব অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ নিয়োজিত করে তাকে মূলধন বলে।

৫। সংগঠনের সংজ্ঞা দাও।

উত্তর: সংগঠন ঃ নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উৎপাদনের উপাদানগুলোকে একত্রিত করে এদের মধ্যে সমন্বয় সাধনপূর্বক কোন প্রতিষ্ঠান গঠন, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের কাজই হল সংগঠন। সংগঠনের কাজটি করে সংগঠক। যিনি উৎপাদনের উপকরণগুলোকে একত্রিত করেন এবং এদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন তিনিই সংগঠক।

প্রামাণ্য সংজ্ঞা :

(i) অধ্যাপক এল. এইচ হ্যানির মতে, “কোন সাধারণ উদ্দেশ্য বা উদ্দেশ্যাবলি অর্জনের জন্য বিশেষায়িত অংশ বা উপাদানসমূহকে সুষ্ঠুভাবে সমন্বয় সাধনের প্রক্রিয়াকে সংগঠন বলে।”

(ii) স্টোনার এর মতে, “সংগঠন হচ্ছে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি, যারা একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা এক সেট লক্ষ্য অর্জনের জন্য একটি কাঠামোগত পদ্ধতির মধ্যে একত্রে কাজ করে।”

রচনামূলক প্রশ্ন উত্তর

১। উৎপাদনের আওতা বা পরিধি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কর।

উত্তর: উৎপাদনের আওতা অত্যন্ত ব্যাপক। প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ থেকে শুরু করে মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের সকল অর্থনৈতিক কার্যক্রম উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল। নিম্নে উৎপাদনের আওতা আলোচনা করা হলো-

১. উপযোগ সৃষ্টি: উপযোগ সৃষ্টি উৎপাদনের আওতাভুক্ত, কারণ উৎপাদনের মাধ্যমে পণ্যের আকার-আকৃতি, রূপ প্রভৃতি পরিবর্তন করে নতুন উপযোগ সৃষ্টি করা হয়।

২. রূপান্তর প্রক্রিয়া: উৎপাদনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর মাধ্যমে প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদের রূপান্তর করা হয়। যেমন- পাট থেকে বস্তা ও কার্পেট তৈরি করা হয়।

৩. পণ্য ডিজাইন: পণ্য ডিজাইন করার সময় ক্রেতাদের চাহিদা, প্রযুক্তিগত সামর্থ্য, উৎপাদন ব্যয় প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করে ডিজাইন করতে হয়।

৪. বিন্যাস: কোনো কারখানার যন্ত্রপাতি, স্থান, আবহাওয়া, পরিবেশ ইত্যাদি নির্বাচন করা হলো উৎপাদনের আওতাধীন। কোন যন্ত্রের পর কোন যন্ত্রের অবস্থান হবে, যে স্থানে রাখলে সহজে উৎপাদন কাজ করা যাবে এবং কারখানার অভ্যন্তরে চলাচল নিরাপদ হবে ইত্যাদি বিষয়ের দিকে খেয়াল রেখে যন্ত্রপাতির সঠিক অবস্থান নির্ণয়কে যন্ত্রপাতি বিন্যাস বলে।
৫. উপকরণ সংগ্রহ: উৎপাদনের আরেকটি আওতাভুক্ত বিষয় হচ্ছে উৎপাদনের সাথে সম্পর্কযুক্ত উপকরণসমূহ সংগ্রহ করা। কি পরিমাণ উপকরণ কিভাবে ব্যবহার হবে ইত্যাদি কার্যক্রম উৎপাদন শুরুর পূর্বেই স্থির করতে হয়। উৎপাদনের উপকরণগুলো হলো ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন।
৬. পদ্ধতি বিশ্লেষণ: উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সহজ ও সরল পদ্ধতি অবলম্বন করলে দক্ষতার সাথে বেশি পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করা সম্ভব হয়।
৯. কারখানার পরিবেশ: কারখানার পরিবেশ উৎপাদনশীলতাকে প্রভাবিত করে। এজন্য কারখানার নিরাপত্তা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, আলো বাতাস, তাপমাত্রা ইত্যাদি অনুকূলে আছে কিনা তা দেখতে হয়।
১০. গবেষণা ও উন্নয়ন: নতুন নতুন পণ্য আবিষ্কারের জন্য গবেষণা প্রয়োজন। এছাড়া পুরাতন পণ্যের উন্নয়নেও গবেষণার বিকল্প নেই। তাই বলা যায় যে, গবেষণা ও উন্নয়ন উৎপাদনের আওতাভুক্ত।
১১. মজুদ নিয়ন্ত্রণ: উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল প্রয়োজন। আর সুষ্ঠুভাবে উৎপাদন কার্য পরিচালনার জন্য পণ্যের মজুদ নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারন সঠিকভাবে পণ্য মজুদ না রাখলে প্রতিষ্ঠানের খরচ বাড়বে ও উৎপাদন প্রক্রিয়া ব্যাহত হবে।
১২. উৎপাদন ক্ষমতা: শ্রম, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ব্যবস্থাপনা এমন হতে হবে যেন সর্বোচ্চ উৎপাদন ক্ষমতা কাজে লাগানো যায়। এতে ব্যয় হ্রাস পায় ও উৎপাদন কাজে দক্ষতা আসে। তাই উৎপাদন ক্ষমতা কাজে লাগানোর জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ উৎপাদনের আওতাভুক্ত।
১৩. প্রশিক্ষণ: উৎপাদন কার্যক্রমের সাথে যারা জড়িত যেমন- শ্রমিক, সুপারভাইজার ও অন্যান্যদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। যথাযথ প্রশিক্ষণ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে। তাই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা উৎপাদনের আওতাভুক্ত।
- উপর্যুক্ত বিষয়গুলো উৎপাদনের আওতাভুক্ত। এছাড়াও আরো অনেক বিষয় উৎপাদনের আওতাধীন রয়েছে। দিন দিন উৎপাদনের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য সৃষ্টি হচ্ছে ফলে নতুন নতুন বিষয় উৎপাদনের ক্ষেত্র যুক্ত হচ্ছে। এ সবকিছুই উৎপাদনের আওতাভুক্ত।
- ২। উৎপাদনের উপকরণ বলতে কী বুঝায়? উৎপাদনের উপকরণসমূহ কত প্রকার ও কী কী? বর্ণনা কর।
- উত্তর: উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয় এমন সবকিছুই উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে বিবেচিত। উৎপাদন বলতে কোনো কিছু সৃষ্টি করাকে বুঝায়। কিন্তু বাস্তবে মানুষ কোনো কিছু সৃষ্টি বা ধ্বংস করতে পারে না। সে শুধু প্রকৃতি প্রদত্ত বস্তুর আকার-আকৃতি পরিবর্তন করে ব্যবহার উপযোগী পণ্যে রূপান্তর করে মাত্র। মানুষ কর্তৃক এরূপ রূপান্তরকেই উৎপাদন বলা হয়। তবে যেকোনো বস্তু আপনা-আপনি উৎপাদিত হয় না। উৎপাদন করতে হলে কতকগুলো উপকরণ বা উপাদান ব্যবহার করতে হয়। যেমন- ফসল উৎপাদিত করতে হলে কেবল ভূমি হলে চলবে না, সেখানে কৃষকের শ্রম, মূলধন ও সংগঠন লাগবে। আবার কারখানার উৎপাদন করতে হলে শুধু মেশিন (মূলধন) থাকলে চলবে না, সেখানে ভূমি, শ্রম ও সংগঠনের প্রয়োজন পড়বে। অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ হতে উৎপাদনের চারটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো- ভূমি, শ্রম, মূলধন এবং সংগঠন। এদের মধ্যে কোনো কোনোটি প্রাকৃতিক এবং কোনো কোনোটি অপ্রাকৃতিক।
- তাই ব্যাপকভাবে বলা যায়, যে সকল প্রাকৃতিক এবং অপ্রাকৃতিক উপকরণের সাহায্যে পণ্য বা সেবার রূপগত ও গুণগত পরিবর্তন করে মানুষের ব্যবহার উপযোগী করে তোলা যায় তাদেরকে একত্রে উৎপাদন উপকরণ বলা হয়।
- নিম্নে উৎপাদনের উপকরণ সম্পর্কে সংজ্ঞা তুলে ধরা হলো,
- অর্থনীতিবিদ Samuelson & Nordhaus বলেন, “উৎপাদনের উপকরণ হলো উৎপাদনক্ষম ইনপুট; যেমন- শ্রম, ভূমি এবং মূলধন; পণ্য বা সেবা উৎপাদনে এগুলো প্রয়োজন।”
- উপরোক্ত আলোচনা ও সংজ্ঞা হতে উৎপাদনের উপকরণ সম্পর্কে নিম্নোক্ত ধারণাগুলো পাওয়া যায়-
১. উৎপাদনের উপকরণ হলো উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত উপকরণ;
 ২. এরূপ উপকরণ প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক হতে পারে;
 ৩. উৎপাদনের উপাদান চারটি যথা- ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন;
 ৪. প্রতিটি উপকরণেরই ব্যবহারিক মূল্য থাকে; এবং
 ৫. ভূমি ছাড়া অন্যান্য উপকরণ স্থানান্তরযোগ্য।
- পরিশেষে বলা যায়, যেসকল প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক উপাদানের সাহায্যে মানুষের ব্যবহার উপযোগী পণ্য বা সেবা উৎপাদন করা যায় তাদেরকে উৎপাদনের উপকরণ বলে। অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ হতে উৎপাদনের উপকরণ চারটি; এগুলো হলো- ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন।
- উৎপাদনের উপকরণসমূহ: উৎপাদন কাজে প্রয়োজন হয় এমন সবকিছুই উৎপাদনের উপাদান। সাধারণত চারটি উপাদানের সমন্বয়ে উৎপাদন কাজ পরিচালিত হয়। যথা- ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন। নিম্নে এ চারটি উপাদানের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো-
১. ভূমি: ভূমি হলো সৃষ্টির আদি ও মৌলিক উপাদান। সাধারণভাবে পৃথিবীর উপরিভাগকে ভূমি বলে। কিন্তু শুধু পৃথিবীর উপরিভাগ ভূমির অন্তর্ভুক্ত নয়। সৃষ্টিকর্তা আমাদের বেঁচে থাকার জন্য এ পৃথিবীতে মাটি, মাটির উর্বরশক্তি, আবহাওয়া, বৃষ্টিপাত, জলবায়ু, তাপ, পানি, বাতাস, সূর্যের আলো, খনিজ সম্পদ, বনজ সম্পদ, মৎস্য ক্ষেত্র, নদ-নদী ইত্যাদি অকাতরে দান করেছেন। সৃষ্টিকর্তার এসকল দানই ভূমির অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ মাটি, মাটির উর্বরশক্তি, আবহাওয়া, বৃষ্টিপাত, জলবায়ু, তাপ, পানি, বাতাস, সূর্যের আলো, খনিজ সম্পদ, বনজ সম্পদ, মৎস্য ক্ষেত্র, নদ-নদী ইত্যাদি যা প্রকৃতি অকাতরে দান করেছে তাকে ভূমি বলে। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ Marshall এর মতে, “ভূমি বলতে ঐ সকল দ্রব্য ও শক্তিসমূহকে বুঝায় যা জলে-স্থলে, আকাশে-বাতাসে পরিব্যাপ্ত এবং যা মানুষের সাহায্যার্থে প্রকৃতি উপহার দিয়েছে।”
 ২. শ্রম: শ্রম হলো উৎপাদনের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মানুষের শারীরিক ও মানসিক যেকোনো প্রকার পরিশ্রমই হলো শ্রম। তবে শ্রম যেখানেরই হোক না কেন, তা অবশ্যই অর্থ উপার্জন বা লাভের উদ্দেশ্যে হতে হবে। কোনো প্রকার লাভ বা অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্য ছাড়া নিছক আনন্দ উপভোগের জন্য ব্যয়িত পরিশ্রম, শ্রম হিসেবে বিবেচিত হয় না। সুতরাং, শ্রম বলতে উৎপাদন কার্যে নিয়োজিত মানুষের শারীরিক ও মানসিক সকল প্রচেষ্টাকেই বুঝায়, যা অর্থ উপার্জনের সাথে সম্পৃক্ত। এ সম্পর্কে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ Marshall বলেছেন, “মানসিক অথবা শারীরিক যেকোনো প্রকার আংশিক অথবা সম্পূর্ণ পরিশ্রম যা আনন্দ ছাড়া আয় অর্জনের উদ্দেশ্যে করা হয় তাকে শ্রম বলে।”
 ৩. মূলধন: মূলধন উৎপাদনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সাধারণভাবে অর্থকে মূলধন হিসেবে গণ্য করা হলেও মূলধনের ধারণাটি এত সংকীর্ণ নয়। ভূমি ও শ্রম ছাড়া ব্যবসায় নিয়োজিত সব কিছুই হলো মূলধন। উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় বা উৎপাদনে সাহায্য করে এরূপ মানুষ সৃষ্ট সকল উপাদানকে মূলধন বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, যেসকল দ্রব্যসামগ্রী মানুষের শ্রম দ্বারা উৎপাদিত এবং যা বর্তমানে ভোগের জন্য ব্যবহৃত না হয়ে অধিকতর উৎপাদনের জন্য পুনরায় উৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত হয় তাকে মূলধন বলে। অর্থনীতিবিদ Chapman বলেছেন, “যে সম্পদ কোনো আয় সৃষ্টি করে অথবা উপার্জনে সহায়তা করে তাই মূলধন।”
- সুতরাং, সঞ্চিত অর্থ ও সঞ্চিত প্রাকৃতিক সম্পদের যুক্তফলই মূলধন। মূলধন ব্যতিরেকে উৎপাদন সম্ভব নয়।

এই সাজেশনটি “HSC BMT/এইচএসসি বিএমটি”
ইউটিউব চ্যানেল ব্যতীত অন্য কোন চ্যানেল বা পেইজ
থেকে নিলে আপনি প্রভাবিত হতে পারেন।

৪. সংগঠন: উৎপাদনের চতুর্থ উপাদানটি হলো সংগঠন। এর মাধ্যমে উৎপাদনের অন্য তিনটি উপাদানকে একত্রিত করা হয়। তাই বলা যায়, নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উৎপাদনের উপাদানগুলোকে একত্রিত করে এদের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ সমন্বয় বিধানপূর্বক কোনো প্রতিষ্ঠান গঠন, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের কাজই হলো সংগঠন। অর্থাৎ যিনি উৎপাদনের উপকরণগুলোকে একত্রিত করেন এবং তাদের মধ্যে সমন্বয় করেন, তাকে সংগঠক বলা হয়। উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উৎপাদনের সকল উপাদান অথবা উপকরণ স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এবং কোনো কিছু উৎপাদন করতে গেলে এই উপাদানগুলো খুবই জরুরী।

৩। ভূমির বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

ভূমির বৈশিষ্ট্য: উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে ভূমি বলতে শুধুমাত্র পৃথিবীর উপরিভাগকেই বুঝায় না। ভূমি বলতে প্রকৃতি প্রদত্ত সকল সম্পদকেই বুঝায়। প্রকৃতি প্রদত্ততা ছাড়াও ভূমির আরো কিছু বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। নিম্নে ভূমির বৈশিষ্ট্যাবলি আলোচনা করা হলোঃ

১. ভূমি প্রকৃতির দান: ভূমি প্রকৃতির অবাধ দান, সৃষ্টিকর্তার দেওয়া শ্রেষ্ঠ নেয়ামত। মানুষ ভূমি সৃষ্টি করতে পারে না। মাটির উর্বরশক্তি, সূর্যালোক, বৃষ্টিপাত, আবহাওয়া, খনিজ সম্পদ, বনজ সম্পদ সবই প্রকৃতি মানুষকে মুক্তহস্তে দান করেছে। প্রকৃতির এরূপ অমূল্য দানের সাহায্যে মানুষ উৎপাদন কার্য সম্পাদন করে।

২. ভূমির যোগান সীমিত: ভূমির যোগান সীমিত। সৃষ্টির শুরুতে সৃষ্টিকর্তা যে পরিমাণ ভূমি আমাদের দান করেছেন, আজও সেই পরিমাণ ভূমিই বিদ্যমান আছে। কোন অবস্থাতেই তার হ্রাস বা বৃদ্ধি হয়নি। আবার ক্রমাগত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে উৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত ভূমির যোগান ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে।

৩. ভূমি বিভিন্ন জাতীয়: এক স্থানের ভূমির সাথে অন্য স্থানের ভূমির উর্বরশক্তির তারতম্য ঘটে। এক স্থানের উৎপাদিত ফসলের সাথে অন্য স্থানে উৎপাদিত ফসলের মধ্যে পার্থক্য হয়, আবার সকল কয়লা খনি থেকে একই মানের কয়লা পাওয়া যায় না। কোন কোন ভূমি অবস্থানগত কারণে উদ্যোক্তাদের নিকট লোভনীয় হয়, আবার কোন কোন ভূমি তাদের নিকট ততটা আগ্রহের সৃষ্টি করে না। ভূমির প্রকৃতি, অবস্থান, জলবায়ু ইত্যাদির উর্বরশক্তি নির্ভর করে।

৪. অস্থানান্তরযোগ্যতা: ভূমি একটি অস্থানান্তরযোগ্য উৎপাদনের উপাদান। তবে ভূমিকে এক স্থান হতে অন্য স্থানে স্থানান্তর করা না গেলেও উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানকে ভূমিতে এনে উৎপাদন কার্য সম্পাদন করা যায়।

৫. ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির কার্যকারিতা: ভূমির ক্ষেত্রে প্রধানত ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটি প্রযোজ্য হয়। ভূমির যোগান সীমিত বলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য একই জমিতে অধিক পরিমাণে শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করতে হয়। এর ফলে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পায় বটে, তবে তা ক্রমহ্রাসমান হারে।

৬. ভূমি অবিবিশ্বাস্য: ভূমির ক্ষয় নাই। অর্থাৎ ভূমি চিরন্তন অস্তিত্বসম্পন্ন। অবশ্য আবাদী জমির উর্বরতা শক্তি হ্রাস পেতে পারে যাকে ভূমি ক্ষয় বলা হলেও তা ধ্বংস হয় না। তাই বলা যায়, উৎপাদনের অন্যান্য উপাদান নশ্বর হলেও ভূমিই একমাত্র উপাদান যা অবিবিশ্বাস্য।

৭. যোগান দাম নেই: উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের যোগান দাম থাকলেও ভূমিই একমাত্র উপাদান যার কোন যোগান দাম নেই। এর মূল কারণ হলো ভূমি সৃষ্টি কর্তার দান, মানুষ তা সৃষ্টি করতে পারে না, একারণে ভূমির যোগান দাম দেওয়ারও প্রয়োজন নেই। তবে জমির খাজনা বা ভাড়া মূল্য আছে। মূলধন ও শ্রম যেহেতু মানব সৃষ্ট তাই এদুটো উপাদানের যোগান দাম দিতে হয়।

পরিশেষে বলা যায়, ভূমি উৎপাদনের একটি উপাদান হলেও এর এমন কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান যা ভূমিকে উৎপাদনের অন্যান্য উপাদান হতে স্বতন্ত্রতা দিয়েছে।

৪। শ্রমের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।

উত্তরঃ বৃহৎ কোনো দেশ যেখানে ভূমির অভাব নেই, মূলধনেরও অভাব নেই কিন্তু শ্রমিকের বড়ই অভাব অর্থাৎ শ্রমিকের উপস্থিতি একেবারেই নেই, সেখানে কি উৎপাদন কার্য সম্পাদন করা সম্ভব? নিশ্চয়ই নয়। এর কারণ হলো- যে কোনো প্রকার পণ্য বা সেবা উৎপাদন করতে হলে শ্রম বা শ্রমিকের উপস্থিতি অপরিহার্য। আবার শ্রমিক শুধুমাত্র উৎপাদনই করে না, ভূমি ছাড়া উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের যোগানদাতাও বটে। ভূমির মধ্যে থেকেই শ্রমিক তার শ্রম দিয়ে একদিকে যেমন উৎপাদন কার্য সম্পাদন করে, অন্যদিকে শ্রমিকের উপার্জিত আয় সঞ্চয়ের মাধ্যমেই মূলধনের সৃষ্টি করে, যা পরবর্তীতে উৎপাদনের উপাদান হিসেবে গণ্য হয়। তা ছাড়া পৃথিবীতে যত কিছুই উৎপাদন করা হোক না কেন তা মূলত মানুষের জন্যই এবং মানুষের শ্রমের দ্বারাই তা উৎপন্ন হয়। আর মানুষই যদি না থাকে, তবে উৎপাদন করে কী লাভ? তাই বলা যায়, যে কোনো প্রকার পণ্য বা সেবা উৎপাদন করতে হলে শ্রম বা শ্রমিকের উপস্থিতি অপরিহার্য। উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে শ্রমের গুরুত্ব নিম্নে আলোচনা করা হলো-

১। সম্পদের সদ্ব্যবহার : শ্রমের সাহায্যে প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক সকল সম্পদের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। প্রকৃতি প্রদত্ত সকল সম্পদ অর্থাৎ পৃথিবীর জলে, স্থলে, সমুদ্রে, খনির অভ্যন্তরে যেখানে যত প্রাকৃতিক সম্পদই থাকুক না কেন, শ্রমের সাহায্যেই তা ব্যবহার উপযোগী করে তোলা যায়। তাই বলা যায়, শ্রম ব্যতিরেকে কোনো সম্পদই কাজে আসে না।

২। জীবিকা নির্বাহ : শ্রম একদিকে যেমন উৎপাদনের উপাদান, অন্যদিকে তেমনি শ্রমের সাহায্যেই শ্রমদাতা তার জীবিকা নির্বাহ করে। শ্রমের বিনিময় মূল্য আছে। এ বিনিময় মূল্য দিয়ে শ্রমদাতা তার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ব্যয়সহ অন্যান্য ব্যয় মিটিয়ে থাকে। অর্থাৎ ব্যক্তিগতভাবে শ্রম জীবিকা নির্বাহের একটি অন্যতম খাত হিসেবে বিবেচিত হয়।

৩। সঞ্চয় সৃষ্টি: আয় হতে ব্যয় বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তাই হলো সঞ্চয়। শ্রমের সাহায্যে মানুষ আয় করে। এ আয় হতে সকল ব্যয় বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তাই হলো শ্রমদাতার সঞ্চয়। তবে আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশি হলে সঞ্চয়ের সৃষ্টি হয় না। বরং ঘাটতির সৃষ্টি হয়। তাই সঞ্চয় সৃষ্টি করতে হলে শ্রম অপরিহার্য। তবে এক্ষেত্রে আয়ের চেয়ে ব্যয় কম হতে হবে।

৪। মূলধন গঠন: মূলধন গঠনের পূর্বশর্ত হলো সঞ্চয়। শ্রম যেহেতু সঞ্চয় সৃষ্টিতে মূল ভূমিকা রাখে, তাই তা মূলধন গঠনেরও পূর্বশর্ত। অর্থাৎ শ্রম ছাড়া কোনো অবস্থাতেই মূলধন গঠন সম্ভব নয়। শ্রমের সাহায্যে শ্রমদাতা আয় উপার্জন করে এবং উক্ত আয় হতে যে সঞ্চয়ের সৃষ্টি হয় তা হতেই মূলধনের সৃষ্টি হয়।

৫। বিনিয়োগ বৃদ্ধি: শ্রমের দ্বারা বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়। শ্রমের দ্বারা পর্যায়ক্রমে আয়, সঞ্চয় এবং মূলধনের সৃষ্টি হয়। সৃষ্ট এ মূলধনই পরবর্তীকালে বিনিয়োগ করা হয়। মূলধন নির্ভর অর্থনীতির এ যুগে যে দেশে যত বেশি মূলধন বিনিয়োগ করা হচ্ছে, সে দেশের অর্থনীতি তত বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হচ্ছে। তাই বলা যায়, বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে শ্রম অর্থনীতিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

৬। উৎপাদন বৃদ্ধি: শ্রম দু'ভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি করে থাকে। উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে প্রত্যক্ষভাবে শ্রম পণ্য ও সেবা উৎপাদনে নিয়োজিত থাকে। আবার শ্রমের মাধ্যমেই মূলধনের সৃষ্টি হয়, যা উৎপাদনের আরেকটি উপকরণ। তাই দেখা যায়, শ্রম প্রত্যক্ষভাবে এবং মূলধন গঠন করে পরোক্ষভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি করে।

নিয়মিত আপডেট পেতে HSC BMT ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটন বাজিয়ে রাখুন

- ৭। ভোগ বৃদ্ধি : শ্রম অর্থাৎ শ্রমদাতা ভোগের একটি অন্যতম পক্ষ পৃথিবীতে যা কিছু উৎপাদন করা হোক না কেন তার সিংহভাগ মানুষ সরাসরি ভোগ করে এবং অবশিষ্ট অংশেও মানুষের পরোক্ষ সম্পর্ক থাকে। আবার শ্রমের মাধ্যমেই শ্রমদাতার অর্থ উপার্জন সম্ভব হয়, যা ভোগের অন্যতম শর্ত। অর্থাৎ শ্রমের মাধ্যমে অর্জিত আয়ের দ্বারাই মানুষ ভোগ কার্যসম্পাদন করতে পারে।
- ৮। জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন : একই সাথে আয় ও ভোগ বৃদ্ধি পেলে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ঘটে। জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে শ্রম ব্যাপক ভূমিকা রাখে। শ্রমের ফলে মানুষের একদিকে যেমন আয় বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে তেমনি উৎপাদন ও ভোগ বৃদ্ধি পেয়ে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ঘটে।
- ৯। অর্থনৈতিক উন্নয়ন : একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শ্রমের গুরুত্ব অনেক। যে দেশের জনগণ যত অলস অথবা শ্রম ব্যবহারের ক্ষেত্র থাকে না। (কর্মক্ষেত্র না থাকা) সে দেশের অর্থনীতি তত পশ্চাদমুখী হয়। শ্রমের সাহায্যে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে সঞ্চয়, মূলধন, বিনিয়োগ ও ভোগ বৃদ্ধি পায়, ফলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে।
- ১০। জাতীয় আয় বৃদ্ধি : জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে শ্রমের গুরুত্ব অপরিসীম দেশের জনগণের আয়, উৎপাদন, কর্মক্ষেত্র ইত্যাদি বৃদ্ধি পেলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়। শ্রমের সাহায্যে দেশের মানুষের আয় ও ভোগ বৃদ্ধি পায়, ফলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে জাতীয় আয়ও বেড়ে যায়।
- পরিশেষে বলা যায়, শ্রম একদিকে যেমন ব্যক্তিক ও পারিবারিক জীবনে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে, অন্যদিকে তেমনি ব্যষ্টিক ও সমষ্টিক পর্যায়ে উৎপাদন বৃদ্ধি করে জাতীয় উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
- ৫। মূলধনের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।
- মূলধনের গুরুত্ব: আধুনিক যুগে উৎপাদনক্ষেত্রে মূলধন এমন কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পাদন করে যার ফলে উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত হয়। একসময় মূলধনকে ‘প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তি’ বলা হতো। উন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বের পার্থক্যের মূলে রয়েছে মূলধনের প্রাপ্যতার পার্থক্য। যে দেশ মূলধনে যত বেশি উন্নত সে দেশ উৎপাদনে তত বেশি উন্নত। উৎপাদন পদ্ধতি জটিল এবং বৃহদায়তন হওয়ায় মূলধনের গুরুত্ব দিন দিন বাড়ছে। বর্তমান উৎপাদন পদ্ধতিতে মূলধন নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পাদন করে:
১. প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার: অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য দেশের সকল সম্পদের সূচু ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। খনিজ, বনজ, জলজ সম্পদসহ সকল প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার একমাত্র মূলধনের ব্যাপক ব্যবহারের মাধ্যমেই সম্ভব। এ সকল সম্পদ আহরণ, উত্তোলন ও ব্যবহার করতে মূলধন একান্ত প্রয়োজন।
 ২. অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিনিয়াদ গঠন: অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সুদৃঢ় অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিনিয়াদ গঠন করা প্রয়োজন। উন্নত যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ শক্তি, সেচ ব্যবস্থা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ব্যাংক প্রভৃতি মৌলিক শিল্প কারখানা গঠন করতে মূলধনের একান্ত প্রয়োজন।
 ৩. শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি: উৎপাদনক্ষেত্রে উন্নতমানের মূলধন ব্যবহারের ফলে শ্রমিকের দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বাড়ে। বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠা ও শ্রমবিভাগের ফলে আমেরিকা, জাপান, জার্মানি প্রভৃতি দেশের শ্রমিকেরা দক্ষতা অর্জন করেছে।
 ৪. বেকার সমস্যা দূরীকরণ: অধিক হারে মূলধন গঠিত হলে দেশে নতুন নতুন শিল্প কারখানা, রাস্তাঘাট, ব্যবসায় বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটে। ফলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় ও বেকারত্ব হ্রাস পায়।
 ৫. কৃষি ও শিল্পের আধুনিকীকরণ: কৃষি ও শিল্প উৎপাদনে উন্নত যন্ত্রপাতি ও মূলধনী দ্রব্য ব্যবহারের ফলে উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদন কৌশল আধুনিক হয়।
 ৬. উৎপাদন বৃদ্ধি: উৎপাদনক্ষেত্রে উন্নত ও অধিক পরিমাণ মূলধন ব্যবহৃত হলে শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। ফলে উৎপাদনও বাড়ে।
 ৭. উৎপাদন ব্যয় হ্রাস: উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করে উৎপাদনক্ষেত্রে অধিক মূলধন ব্যবহারের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। এজন্য উৎপাদনের গড় ব্যয় কমে যায়। জনসাধারণ কম দামে পণ্য ক্রয় করতে পারে এবং মোট সামাজিক কল্যাণ বৃদ্ধি পায়।
 ৮. শ্রমবিভাগ প্রবর্তন: অধিক পরিমাণ মূলধন ব্যবহৃত হলে উৎপাদন পদ্ধতিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা যায়। ফলে বিভিন্ন অংশের দায়িত্ব বিভিন্ন শ্রমিক শ্রেণির ওপর ন্যস্ত করা যায়।
 ৯. জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন: অধিক মূলধন ব্যবহারের ফলে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। এ কারণে মজুরি বাড়ে এবং শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়।
 ১০. আবিষ্কারের সূচনা করে: শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের ফলে শ্রমিকদের অনুসন্ধিৎসা সৃষ্টি হয়। একই যন্ত্র নিয়ে বার বার কাজ করার ফলে নতুন নতুন যন্ত্রপাতি ও কৌশল আবিষ্কার করতে পারে।
 ১১. শিল্পোন্নয়ন: শিল্পোন্নয়ন মূলত মূলধনের ওপর নির্ভরশীল। কেননা মূলধনের যোগান বাড়লে নতুন নতুন শিল্প কারখানা গড়ে ওঠে।
 ১২. উৎপাদনের ধারাবাহিকতা রক্ষা: উৎপাদনক্ষেত্রে পর্যাপ্ত মূলধন ব্যবহৃত হলে উৎপাদন অবিরাম গতিতে চলতে থাকে ফলে উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে।
- সুতরাং, অর্থনৈতিক উন্নয়নে মূলধনের গুরুত্ব অনেক বেশি। আধুনিক ও উন্নত উৎপাদন ব্যবস্থা প্রসারের জন্য মূলধন ব্যবহার অপরিহার্য। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মূলধনের স্বল্পতার জন্যই উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যাহত হয়। দারিদ্র্যের দৃষ্টচক্র ভেঙে উন্নয়ন ঘটাতে মূলধনই একমাত্র হাতিয়ার।
- ৬। মূলধনের গুরুত্ব আলোচনা কর।
- উত্তর: উৎপাদনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হওয়ার পাশাপাশি মূলধন দেশের অর্থনীতিতে আরও বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিম্নে মূলধনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করা হলো-
- ১। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি : মূলধন ব্যবহারের ফলে যে কোন দেশে প্রচুর পরিমাণে কলকারখানা, রাস্তাঘাট, ব্রিজ-কালভার্ট ইত্যাদিসহ শিল্পায়ন ঘটে। আর একটি দেশে যখন শিল্পায়ন ঘটে তখন ব্যাপক আকারে লোকজনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। ২। উৎপাদন ব্যয় হ্রাস : মূলধনের সাহায্যে নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করা সম্ভব হয়। নতুন নতুন আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে প্রচুর পরিমাণে উন্নতমানের পণ্য স্বল্প সময়ে উৎপাদন করা সম্ভব। এতে একক প্রতি ব্যয় হ্রাস পায়।
 - ৩। উৎপাদনের গতিশীলতা আনয়ন : মূলধনের সাহায্যে উৎপাদনের গতিশীলতা আনয়ন করা যায়। মূলধনের সাহায্য ছাড়া যে পরিমাণ পণ্যসামগ্রী উৎপাদন করা যায়, মূলধনের সাহায্যে তার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি পণ্যসামগ্রী উৎপাদন করা সম্ভব।
 - ৪। সম্পদের সূচু ব্যবহার : প্রাকৃতিক ও প্রাপ্রাকৃতিক সম্পদের সূচু ব্যবহারের জন্য মূলধন একান্ত প্রয়োজন। একটি দেশে যতই প্রাকৃতিক সম্পদ থাকুক না কেন, যদি মূলধনের অভাব থাকে তাহলে সেই প্রাকৃতিক সম্পদ উত্তোলন ও ব্যবহার উপযোগী করা সম্ভব নয়।
 - ৫। শ্রমের দক্ষতা বৃদ্ধি : শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধিতেও মূলধন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যে কোন প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন।
 - ৬। উৎপাদন ও ভোগের সমন্বয় সাধন : মূলধনের সাহায্যে একদিকে যেমন দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়, অন্যদিকে তেমনি জনগণের আয়ও বৃদ্ধি পায়।

৭। দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন : যে কোন দেশের উন্নয়নের জন্য অবকাঠামোর উন্নয়ন আবশ্যিক। অবকাঠামো বলতে রাস্তাঘাট, ব্রিজ-কালভার্ট, বন্দর ইত্যাদিকে বুঝায়। এসব অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য মূলধন একান্ত প্রয়োজন।

৮। মুনাফা সর্বাধিককরণ : ঝুঁকি গ্রহণ মুনাফা বৃদ্ধির সম্ভাব্যতাকে বাড়িয়ে দেয়। কম মূলধন থাকলে মানুষ বেশি ঝুঁকি গ্রহণ করতে চায় না। আবার অধিক মূলধন থাকলে মানুষ ঝুঁকি গ্রহণ করে। সেই ঝুঁকি মুনাফা সর্বাধিককরণের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়।

৯। সময় শাস্ত্র : অধিক মূলধন বিনিয়োগের মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করে স্বল্প সময়ে অধিক পণ্য উৎপাদন করা সম্ভব, যা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সময় বাঁচায়।

১০। জাতীয় আয় বৃদ্ধি : যে দেশের মূলধন বিনিয়োগের সামর্থ্য যত বেশি, তার জাতীয় আয়ের পরিমাণও তত বেশি। বেশি মূলধন বেশি উৎপাদনের নিশ্চয়তা প্রদান করে, আর সেই বেশি উৎপাদন জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে অবদান রাখে।

পরিশেষে বলা যায় যে, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মূলধনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাপকভাবে দেখা যায়।

৭। সংগঠনের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর।

সংগঠনের বৈশিষ্ট্য : নিম্নে সংগঠনের উদ্দেশ্য বা বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করা হল-

১। উপাদানগুলোর মধ্যে সময় সাধন : সংগঠন হল উৎপাদন কাজে নিয়োজিত ভূমি, শ্রম ও মূলধনকে সময় ও সুসংহত করার প্রক্রিয়া।

২। দায়দায়িত্ব বন্টন : সংগঠনের সাহায্যে প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত সকল ব্যক্তিদের মধ্যে যথাযথ উপযুক্তভাবে দায়দায়িত্ব বন্টন করা হয়।

৩। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য : মুনাফা লাভের আশায় উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণগুলোকে সংগ্রহকরণ ও তাদের মধ্যে সময় সাধন করাই সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য।

৪। পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ : সংগঠনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বদা প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক নির্ধারণ করা হয়।

৫। শ্রম বিভাজন : উৎপাদন কার্যক্রমকে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য সব সময় সতর্কতার সাথে কাজগুলোকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা হয়।

৬। কাজের বিন্যাস : সংগঠনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল কাজের বিন্যাস। কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী সংগঠনে বিভিন্ন বিভাগ সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ে সম্পাদিত কার্যসমূহ সুশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত থাকে।

৭। সমন্বিত প্রচেষ্টা : সংগঠনে বিভিন্ন ব্যক্তি, দল ও বিভাগের কাজের মধ্যে সমন্বয়ের প্রচেষ্টা দেওয়া হয়। এখানে একাধিক ব্যক্তি বা দল একত্র হয়ে প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য সমন্বিত প্রচেষ্টা চালায়। সকলের সহযোগিতা আর সমন্বিত প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই সংগঠন উদ্দেশ্য অর্জনের দিকে ধাবিত হয়।

৮। আদেশের ঐক্য : সংগঠনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল আদেশের ঐক্য রক্ষা করা। একজন শ্রমিককে যদি কয়েকজন উর্ধ্বতন আদেশ দেন তাহলে বিশৃঙ্খল সৃষ্টি হবে। প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য আদেশের ঐক্য জরুরি।

৯। পরিবর্তনশীলতা : পরিবেশ পরিস্থিতির পরিবর্তন হলে সংগঠন কাঠামোতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনার সুযোগ থাকতে হবে।

১০। কর্মীর মনোভাব : সংগঠন কর্মীদের গঠনমূলক মনোভাব বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। কর্মীদের অনুকূল মনোভাব তাদের কার্য সক্ষমতা বৃদ্ধি করে। ফলে তারা উৎসাহ-উদ্দীপনা ও আগ্রহ নিয়ে প্রতিষ্ঠানের জন্য মানসম্মত পণ্য উৎপাদনে নিজেদের নিয়োজিত করে।

পরিশেষে বলা যায় যে, সংগঠনের বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্যগুলো উপরের আলোচনা হতে সঠিকভাবে জানা

৮। সংগঠনের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।

উত্তর: উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় এক ব্যক্তির পক্ষে উৎপাদন সংক্রান্ত সকল কাজ একাকি সম্পাদন করা সম্ভব নয়। তা ছাড়া এর সাথে জড়িত ঝুঁকিও একার পক্ষে বহন করা কষ্টকর। এ অবস্থায় একমালিকানা সংগঠন হতে অংশীদারি, যৌথমূলধনী, ইত্যাদি সংগঠনের জন্ম হয়। নিচে সংগঠনের প্রকারভেদ তুলে ধরা হলো:-

১। একমালিকানা সংগঠন: একক মালিকানায় গঠিত ও পরিচালিত ব্যবসায়কে একমালিকানা ব্যবসায় সংগঠন বলে। এ সংগঠনের মূল বৈশিষ্ট্য হলো একক মালিকানা, একক পরিচালনা, একক নিয়ন্ত্রণ, একক ঝুঁকি, একক মুনাফা ইত্যাদি। তবে এ ব্যবসায় সংগঠনের কিছ অসুবিধাও রয়েছে, এগুলো হলো মূলধন সীমিত থাকার প্রয়োজনে সম্প্রসারণ করা যায় না, মালিকের সীমাহীন দায় এবং যে কোন কারণে সহজেই এ সংগঠন ভেঙে যায়।

২। অংশীদারি সংগঠন: একাধিক ব্যক্তি মুনাফার উদ্দেশ্যে চুক্তির ভিত্তিতে যে ব্যবসায় সংগঠন করে তাকে অংশীদারি ব্যবসায় সংগঠন বলে। বাংলাদেশে বহাল ১৯৩২ সালের অংশীদারি আইন অনুযায়ী এ ব্যবসায় কমপক্ষে ২ জন এবং সর্বোচ্চ ২০ জন সদস্য থাকতে পারে।

৩। যৌথ মূলধনী ব্যবসায় বা কোম্পানি সংগঠন: যৌথ মূলধনী ব্যবসায় বা কোম্পানি সংগঠন হলো আইনসৃষ্ট, কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তার অধিকারী, চিরন্তন অস্তিত্ব বিশিষ্ট ব্যবসায় সংগঠন। যৌথ মূলধনী কোম্পানি সংগঠনকে আবার দুইভাবে ভাগ করা যায়। যথা:

ক. প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি

খ. পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি

৪। সমবায় সমিতি: কমপক্ষে বিশজন চুক্তি সম্পাদনে যোগ্য ব্যক্তি নিজেদের অর্থনৈতিক কল্যাণের লক্ষ্যে পারস্পরিক ঐক্য, সহযোগিতা ও সমঝোতার ভিত্তিতে সমবায় আইনের আওতায় যে সংগঠন গড়ে তোলে তাকে সমবায় সমিতি বলা হয়। এটি মূলত কম বিত্তসম্পন্ন মানুষের সংগঠন।

৫। রাষ্ট্রীয় সংগঠন: রাষ্ট্র বা সরকার কর্তৃক স্থাপিত বা বেসরকারি খাতে স্থাপিত কিন্তু পরবর্তীতে জাতীয়করণকৃত কোন ব্যবসায়ের চূড়ান্ত মালিকানা ও পরিচালনার দায়িত্ব সরকারের অধীনে থাকলে তাকে রাষ্ট্রীয় সংগঠন বলে।

৬। যৌথ উদ্যোগে ব্যবসায় সংগঠন: দেশি ও বিদেশী উদ্যোক্তাদের সমন্বয়ে কোন ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনা করা হলে, তাকে যৌথ উদ্যোগে ব্যবসায় সংগঠন বলা হয়। এরূপ ব্যবসায় সংগঠনের সুবিধা হলো দেশের অভ্যন্তরে বিদেশি পুঁজি ও প্রযুক্তির সহজ আগমন ঘটে, দেশে অভ্যন্তরীণ সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার।

উপরোক্তভাবে আমরা ব্যবসায় সংগঠনের প্রকারভেদ আলোচনা করতে পারি।

অধ্যায়-০২: উৎপাদনের মাত্রা

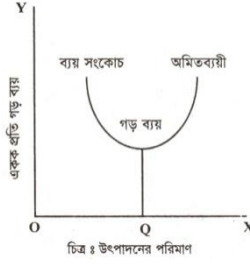
সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর

১। উৎপাদনের কাম্য মাত্রার ধারণা দাও।

উত্তর: সকল ব্যয় ও সামর্থ্যকে হিসাবে ধরে যে পর্যায়ে একটি পণ্যের গড় উৎপাদন ব্যয় সর্বনিম্ন হয়, তাকে ঐ পণ্যের উৎপাদনের কাম্য মাত্রা বলে। উৎপাদনের কাম্য মাত্রা হলো প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন অবস্থার এমন একটি পর্যায় যেখানে গড় ব্যয় সর্বনিম্ন হয়। অর্থাৎ, উৎপাদন ব্যয় একক প্রতি সর্বনিম্ন মাত্রায় পৌঁছায়। গড় ব্যয় নির্ধারণের সময় স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি সকল ব্যয় যেমন- বেতন, মজুরি, ভাড়া, অবচয় ইত্যাদি হিসাব করা হয়।

চিত্রের সাহায্যে কাম্য উৎপাদন মাত্রা তুলে ধরা হলো:-

নিয়মিত আপডেট পেতে HSC BMT ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটন বাজিয়ে রাখুন



এই সাজেশনটি “HSC BMT/এইচএসসি বিএমটি”
ইউটিউব চ্যানেল ব্যতীত অন্য কোন চ্যানেল বা পেইজ
থেকে নিলে আপনি প্রভাবিত হতে পারেন।

চিত্রে OX অক্ষে উৎপাদনের পরিমাণ ও OY অক্ষে একক প্রতি গড় ব্যয় নির্দেশ করে। এখানে Q বিন্দু হলো উৎপাদনের মাত্রা যেখানে প্রতিষ্ঠান সর্বনিম্ন ব্যয় করে সর্বোচ্চ পণ্য উৎপাদন করতে পারে।

২। মাত্রাজনিত ব্যয় সংকোচন কাকে বলে?

উত্তর: ব্যয়ের সাথে উৎপাদন মাত্রা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সাধারণত উৎপাদন বাড়লে একক প্রতি উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায়। তাই প্রতিযোগিতার বাজারে উৎপাদন ব্যয় কমিয়ে সবচেয়ে বেশি সুবিধা অর্জনের প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানই সর্বোচ্চ উৎপাদন মাত্রায় পৌঁছাতে চেষ্টা করে। উৎপাদন বাড়লে একক প্রতি উৎপাদন ব্যয় কেন হ্রাস পাবে তা বুঝার জন্য ব্যয়ের ধরন জানা প্রয়োজন।

Chase & Aquilano-এর মতে, “মিতব্যয়ী উৎপাদন মাত্রা কোন প্রক্রিয়ায় সর্বোত্তম কার্যপরিচালনার স্তরকে নির্দেশ করে।”

Gibbs-এর মতে, “উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে একক প্রতি ব্যয় হ্রাস পাওয়াকে মাত্রাজনিত ব্যয় সংকোচন বলে।”

একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে স্বাভাবিকভাবে কিছু ব্যয় রয়েছে, যা উৎপাদন হোক বা না হোক খরচ হবেই। তাই কোন একক উৎপাদন না হলেও যে খরচ হয় তা পুরোটাই ব্যবসায়ের ক্ষতি হিসেবে গণ্য হয়। এ ব্যয়ের ধরনের পার্থক্য উৎপাদন মাত্রার দ্বারা প্রভাবিত।

উপরোক্তভাবে আমরা মাত্রাজনিত ব্যয় সংকোচনের ধারণা আলোচনা করতে পারি।

৩। ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান কাকে বলে?

উত্তর : ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান : কোনো উৎপাদন শিল্পে ভূমি ও কারখানা বাদ দিয়ে স্থায়ী সম্পত্তির মূল্য যদি ন্যূনতম ৫০ লাখ টাকা থেকে ১০ কোটি টাকা এবং শ্রমিকের সংখ্যা যদি ২৫ থেকে সর্বোচ্চ ৯৯ জনের মধ্যে সীমিত থাকে, তবে তাকে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান বলে। কিন্তু, বাণিজ্যিক ও সেবাখাতে কর্মীর সংখ্যা ১০-২৫ জন এবং ভূমি ও কারখানা দালান বাদে স্থায়ী সম্পত্তির পরিমাণ যদি ৫ লাখ টাকা থেকে ১ কোটি টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়, তাকেও ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান বলা যায়।

(i) ফ্লোরা রিচার্ডের মতে, “যে ব্যবসায় ক্রমসংখ্যক কর্মী কাজ করে এবং বিক্রির সংখ্যা খুব বেশি নয়, সে রকম ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান বলে।”

(ii) স্টোনার, ফ্রিম্যান এবং গিলবার্ট-এর মতে, “যে ব্যবসায় খুব অল্পসংখ্যক কর্মী নিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে স্থানীয় মালিকানায় পরিচালিত হয়, তাকে ক্ষুদ্র এন্টারপ্রাইজ বলে।”

সুতরাং বলা যায় যে, যেসব উৎপাদক বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্বল্প পুঁজি নিয়ে পরিচালিত হয়, শ্রমিক সংখ্যা কম থাকে এবং বিক্রয়ের পরিমাণ কম থাকে, তাকে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান বলে।

৪। মাঝারি প্রতিষ্ঠান কাকে বলে?

উত্তর : মাঝারি প্রতিষ্ঠান : কোনো উৎপাদনধর্মী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ভূমি ও কারখানা দালান বাদে কোন শিল্পের সম্পত্তির স্থায়ী মূল্য ন্যূনতম ১০ কোটি টাকা থেকে ৩০ কোটি টাকা এবং শ্রমিকের সংখ্যা ১০০ জন থেকে সর্বোচ্চ ২৫০ জন হলে, তাকে মাঝারি প্রতিষ্ঠান বলে। কিন্তু বাণিজ্যিক ও সেবা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে যদি শ্রমিক সংখ্যা ৫০ থেকে ১০০ জন এবং ভূমি ও দালান বাদে স্থায়ী সম্পত্তির পরিমাণ যদি ১ কোটি টাকা থেকে ১৫ কোটি টাকা টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়, তবে তাকেও মাঝারি প্রতিষ্ঠান বলা যায়। মাঝারি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে Europa.eu-তে বলা হয়েছে, মাঝারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে এমন প্রতিষ্ঠানকে সংজ্ঞায়িত করা যায়, যেখানে ২৫০ এর কম কর্মী থাকবে এবং যাদের বার্ষিক টার্নওভার ৫০ মিলিয়ন ইউরোর বেশি হবে না। মাঝারি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বাংলাদেশের শিল্পনীতিতে স্পষ্ট ধারণা দেওয়া হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, যে উৎপাদক বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তির মূল্য সর্বোচ্চ তিন কোটি অথবা শ্রমিকের সংখ্যা সর্বোচ্চ আড়াইশ জন, তাকে মাঝারি প্রতিষ্ঠান বলে।

৫। উৎপাদনের মাত্রার ধারণা দাও?

উত্তর: সাধারণ অর্থে, উৎপাদন মাত্রা হলো প্রতিষ্ঠানের সকল সুযোগ-সুবিধা বিবেচনা করে উৎপাদিত পণ্য বা সেবার পরিমাণ। অর্থাৎ, কোনো উৎপাদন প্রতিষ্ঠান কতটুকু পরিমাণে বা কি আয়তনে উৎপাদন করে তা হচ্ছে ঐ প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন মাত্রা। স্বল্প পরিমাণে উৎপাদন করলে উৎপাদনের মাত্রা নিম্ন আর অধিক পরিমাণে উৎপাদন করলে উৎপাদনের মাত্রা উচ্চ হয়। ব্যাপক অর্থে বলা যায় যে, ক্রেতাদের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের সকল সুযোগ-সুবিধা (ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন) এর আলোকে যে পরিমাণ পণ্য সামগ্রী উৎপাদন করা হয় তাই হলো উৎপাদনের মাত্রা। উৎপাদনের মাত্রা নির্ভর করে সেই প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়ীর আর্থিক সামর্থ্য, ব্যবস্থাপনার দক্ষতা, বাজার পরিস্থিতি ও অন্যান্য অবস্থার উপর।

উৎপাদন মাত্রা সম্পর্কে কতিপয় সংজ্ঞা:

Economic Concept 4 অনুসারে, “উৎপাদন মাত্রা হচ্ছে উৎপাদনকারী কর্তৃক গৃহীত কারখানার আয়তন, স্থাপিত কারখানার সংখ্যা এবং উৎপাদন কৌশল।”

Alfred Marshall, “উৎপাদনের মোট এককের পরিমাণকে উৎপাদন মাত্রা বলে।”

উৎপাদন মাত্রা সম্পর্কিত আলোচনায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলো দেখা যায়-

১. উৎপাদন মাত্রা হলো মোট উৎপাদনের পরিমাণ;

২. উৎপাদনের উপকরণ বৃদ্ধি পেলে উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধি পায়;

৩. উৎপাদন মাত্রা প্রতিষ্ঠানের আয়তন নির্দেশ করে;

৪. উৎপাদনের মাত্রা পণ্যের প্রয়োজনীয় মাত্রা, পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামালের প্রকৃতি এবং উৎপাদিত পণ্যের ধরন দ্বারা প্রভাবিত হয়; এবং

৫. দক্ষভাবে কাজ করলে অদক্ষতাজনিত ব্যয় হ্রাস পায়।

পরিশেষে বলা যায়, প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সামর্থ্য, ব্যবস্থাপনার দক্ষতা, বাজার পরিস্থিতি, উৎপাদন কৌশল এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বিবেচনা করে উৎপাদনকারী কর্তৃক গৃহীত কৌশলের মাধ্যমে মোট যে পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করা হয় তাকে উৎপাদন মাত্রা বলে।

এই সাজেশনটি “HSC BMT/এইচএসসি বিএমটি”
ইউটিউব চ্যানেল ব্যতীত অন্য কোন চ্যানেল বা পেইজ
থেকে নিলে আপনি প্রভাবিত হতে পারেন।

রচনামূলক প্রশ্ন উত্তর

১। ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজ/প্রতিষ্ঠানের সুবিধা-অসুবিধা আলোচনা কর।

উত্তর: ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজের সুবিধা: অন্যান্য শিল্পের তুলনায় ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কিছু বিশেষ সুবিধা পরিলক্ষিত হয়। সুবিধাগুলো নিচে আলোচনা করা হলো-

১. ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধান: ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজের উৎপাদন ক্ষেত্র স্বল্প পরিসর হওয়ায় সংগঠকগণ সরাসরি শ্রমিকদের কাজ তদারক করতে পারেন, ফলে সংগঠক ব্যবস্থাপনার দক্ষতাকে ব্যবহার করে শ্রমিকদের নির্দেশনা দেয় এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পায়।

২. দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ: এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে মালিকগণই ব্যবস্থাপক, পরিচালক এবং নীতি নির্ধারক হন বলে তারা যেকোনো সময়, প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত দ্রুততার সাথে গ্রহণ করতে পারেন।

৩. স্বল্প বিজ্ঞাপন খরচ : ক্ষুদ্র ও মাঝারি উৎপাদন ব্যবস্থায় সাধারণত স্থানীয় ক্রেতাদের চাহিদা অনুযায়ী দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন করে থাকে। ফলে ক্রেতাদের পণ্য সম্পর্কে অবগতি বা তাদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য খুব বেশি প্রচার অভিযানের প্রয়োজন হয় না।

৪. সহজ গঠন: ক্ষুদ্র ও মাঝারী এন্টারপ্রাইজের আরেকটি সুবিধা হচ্ছে এটি সহজে গঠন করা যায়। এক্ষেত্রে বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানের মতো আইনগত তেমন কোন আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয় না এ কারণে অনেকেই এ ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে আগ্রহী হয়।

৫. সীমিত মূলধন: এ ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য সীমিত পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন হয় বলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজ খুব সহজেই গড়ে তোলা সম্ভব হয়।

৬. ভোক্তাদের সাথে সম্পর্ক: ক্ষুদ্র ও মাঝারী এন্টারপ্রাইজের পক্ষে ভোক্তাদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা সম্ভব হয়। বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে সাফল্য লাভের জন্য এটি খুবই প্রয়োজন। বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এ সম্পর্ক ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে।

৭. অপচয় হ্রাস: ক্ষুদ্র ও মাঝারী প্রতিষ্ঠানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মালিক নিজেই দেখাশোনা করেন। এছাড়া আয়তন ছোট বলে মালিকের পক্ষে সরাসরি সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়। এতে অপচয় হ্রাস পায়, যা ব্যয় হ্রাস করে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে।

৮. নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি: কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্বল্প মূলধন ও সহজ গঠন বলে দরিদ্র উদ্যোক্তারাও ছোট আকারে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারে।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজের অসুবিধা: ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজ শিল্পের উৎপত্তির সময় থেকে টিকে থাকলেও বিভিন্ন সময় ও কারণে একে নানাবিধ সমস্যায় পড়তে হয়। নিচে অসুবিধাগুলো আলোচনা করা হলো:

১. অধিক উৎপাদন ব্যয়: ক্ষুদ্র ও মাঝারী এন্টারপ্রাইজের অন্যতম প্রধান অসুবিধা হচ্ছে অধিক উৎপাদন ব্যয়। মূলধনের অভাবে দক্ষ শ্রমিক, আধুনিক যন্ত্রপাতি, উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা যায় না। এছাড়া শ্রমবিভাগ করা হয় না বলে শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা কমে যায়। আবার, কাঁচামাল অল্প পরিমাণে কেনা হয় বলে খরচ বেশি পড়ে। এসব কারণে এক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যায়।

২. মূলধনের অপতুলতা: পর্যাপ্ত মূলধনের অভাব ক্ষুদ্র ও মাঝারী এন্টারপ্রাইজের অগ্রগতিকে ব্যহত করে। ব্যাংক, বিমা ও ঋণদানকারি প্রতিষ্ঠানগুলো এদেরকে সহজ শর্তে পর্যাপ্ত ঋণ দিতে উৎসাহ দেখায় না। ফলে মূলধনের অভাবে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা করা যায় না।

৩. আধুনিকীকরণ প্রতিবন্ধকতা: ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পে সাধারণত দেশি ও নিম্নমানের যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়। আধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি যথেষ্ট ব্যয়বহুল হওয়ায় আর্থিক সংকটের কারণে অনেক ক্ষেত্রেই আধুনিকীকরণ সম্ভব হয় না। এছাড়া কারিগরি জ্ঞানের অভাবে অনেক সময় মালিকও এতে উৎসাহ দেখায় না।

৪. গবেষণার অভাব: নতুন উৎপাদন পদ্ধতি উন্নয়ন, পণ্যের মান উন্নয়ন, নতুন পণ্য উদ্ভাবন বা ব্যয় সাশ্রয়ী প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা করা প্রয়োজন। অর্থ ও বিশেষজ্ঞের অভাবে ক্ষুদ্র ও মাঝারী এন্টারপ্রাইজ এ ধরনের গবেষণা কার্যক্রম চালাতে পারে না। এতে প্রতিষ্ঠান প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে।

৫. ঋণ সংগ্রহের অসুবিধা: ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকৃতির প্রতিষ্ঠানের স্থায়ীত্ব, সুনাম এবং পর্যাপ্ত বন্ধকী সম্পদের অভাবে ব্যাংক ও অন্যান্য ঋণদান সংস্থা সহজ শর্তে প্রয়োজনীয় ঋণ দিতে রাজী থাকে না। ফলে পর্যাপ্ত ঋণ সুবিধার অভাবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকৃতির এন্টারপ্রাইজের প্রসার ঘটে না।

৬. চাহিদা পূরণে অক্ষম: বর্ধিত চাহিদা পূরণে সীমাবদ্ধতা ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজের একটি সমস্যা। বাজারে ব্যাপক চাহিদা থাকার পরেও ক্ষুদ্র ও মাঝারী প্রতিষ্ঠান তা পূরণ করতে পারে না।

৭. দক্ষ ব্যবস্থাপনার অভাব: দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যবস্থাপনার জন্য এন্টারপ্রাইজগুলোকে উচ্চ হারে ব্যবস্থাপনা বাবদ খরচ প্রদান করতে হয়। ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অনেক সময়ই উচ্চ বেতন ভাতা প্রদান সম্ভব হয় না।

৮. অদূরদর্শিতা: দূরদর্শিতা একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। কিন্তু ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজগুলোতে স্বল্প মূলধনের ব্যবসায় আরম্ভ করা যায় বলে প্রায়শ সূচিক্রমে পরিকল্পনা ব্যতিরেকে বিভিন্ন প্রকল্প শুরু করে যা মাঝপথে থেমে যায়।

উপরোক্তভাবে আমরা ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজের সুবিধা-অসুবিধা আলোচনা করতে পারি।

২। বৃহদায়তন এন্টারপ্রাইজের সুবিধা-অসুবিধা আলোচনা কর।

উত্তর : নিচে বৃহদায়তন এন্টারপ্রাইজের সুবিধাসমূহ আলোচনা করা হলো:-

১. মূলধন সংগ্রহের সুবিধা: বৃহদায়তন এন্টারপ্রাইজ সহজে প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করতে পারে বিনিয়োগকারীরা বড় প্রতিষ্ঠানের প্রতি বেশি আগ্রহ দেখায়। এছাড়া ব্যাংক, বিমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো বড় প্রতিষ্ঠানকে সহজে ঋণ দেয়। অনেক সময় বড় প্রতিষ্ঠান কম সুদেও ঋণ নিতে পারে।

২. শ্রমবিভাগ: বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠান উৎপাদন প্রক্রিয়াকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে শ্রমিকদের ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ বন্টন করে। এতে শ্রমিক সেই বিশেষ কাজে দক্ষ হয়ে উঠে যা তার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে।

৩. দক্ষ ব্যবস্থাপনা: দক্ষ ব্যবস্থাপনার উপর কারবারের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে। বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অধিক বেতন দিয়ে দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যবস্থাপনা নিয়োগ করা সম্ভব হয়। ফলে কারবারের সামগ্রিক কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে ও দক্ষতার সাথে পরিচালিত হতে পারে।

৪. পরিবহন সুবিধা: বৃহদায়তন এন্টারপ্রাইজ এক সাথে অধিক পরিমাণ কাঁচামাল ক্রয় করে, এতে কাঁচামাল পরিবহন ব্যয় কমে যায়। আবার, বাজারজাতকরণের উদ্দেশ্যে একসাথে বেশি পরিমাণ পণ্য বিভিন্ন বিক্রয় কেন্দ্রে প্রেরণ করা যায়। এভাবে বৃহদায়তন এন্টারপ্রাইজ পরিবহন ব্যয় কমাতে পারে।

৫. বাণিজ্যিক সুবিধা: বৃহদায়তন এন্টারপ্রাইজগুলো একত্রে অনেক বেশী পরিমাণ যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল ক্রয় করে ফলে এর ক্রয় খরচ তুলনামূলক কম হয় এবং প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন খরচও অনেক কমে যায়। যে কারণে কম মূল্যে সহজেই পণ্য ক্রেতাদের নিকট বিক্রয় সম্ভব হয়। সুলভ মূল্যে বেশী পরিমাণ পণ্য বিক্রি করতে পারার কারণে প্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগিতামূলক শক্তি তুলনামূলকভাবে অনেক বেড়ে যায়।

৬. প্রচার সুবিধা: বৃহদায়তন এন্টারপ্রাইজগুলো তাদের উৎপাদিত পণ্যের প্রসারের মাধ্যমে ক্রেতাদেরকে দ্রব্যের গুণাগুণ, মূল্য, প্রাপ্তির স্থান, ব্যবহারের কৌশল ইত্যাদি বিষয়গুলো অবহিত করে এবং এজন্য প্রতিষ্ঠানগুলো প্রচুর পরিমাণ অর্থও ব্যয় করে থাকে। আর তাই এক্ষেত্রে উৎপাদনের পরিমাণ যত বেশী হবে পণ্যের বিপণন ব্যয়ও তুলনামূলক অনেক কমে যাবে।

৭. স্থায়ী ব্যয়ে মিতব্যয়িতা: উৎপাদন বেশি হলে একক প্রতি স্থায়ী ব্যয় কম হয়। যেমন- একজন ব্যবস্থাপকের বেতন ৫০,০০০ টাকা। এখন উৎপাদন কম বা বেশি যাই হোক ব্যবস্থাপককে একই বেতন দিতে হবে। জমির খাজনা বা ভাড়ার ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। তাই বৃহদায়তন এন্টারপ্রাইজ উৎপাদন বেশি করে একক প্রতি স্থায়ী ব্যয় কমাতে পারে।

৮. বৃহৎ ক্রয়ের সুবিধা: বৃহদাকার কারবার প্রতিষ্ঠানগুলো একসাথে প্রচুর পরিমাণে কাঁচামাল ও পণ্যদ্রব্য ক্রয় করে থাকে। ফলে মূল্যের দিক থেকে অনেকটা সুবিধা পাওয়া যায় এবং ক্রয়জনিত বিভিন্ন খরচও গড়পড়তা কম পড়ে।

৯. দক্ষ কর্মী নিয়োগ: দক্ষ কর্মী নিয়োগ ও ধরে রাখতে হলে তাদের অধিক বেতন ভাতা দিতে হয়। বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সামর্থ বেশি থাকায় দক্ষ কর্মী নিয়োগ দিতে পারে। আর পদোন্নতির সুযোগ বেশি থাকায় কর্মীরা বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে।

১০. নূনতম ব্যয়ে উৎপাদন: কম মূল্যে কাঁচামাল ক্রয় এবং বৃহদায়তনের উৎপাদনের সুবিধা থাকায় বৃহদাকার প্রতিষ্ঠানগুলোর একক প্রতি উৎপাদন খরচ কম হয়। ফলে উৎপাদিত পণ্যের মূল্যও কম হয়ে থাকে।

নিচে বৃহদায়তন এন্টারপ্রাইজের অসুবিধাসমূহ আলোচনা করা হলো:- বিভিন্ন সুবিধা থাকা সত্ত্বেও বৃহদায়তন এন্টারপ্রাইজের যেসব অসুবিধা পরিলক্ষিত হয় তা নিম্নরূপ-

১. ব্যবস্থাপনার অসুবিধা: প্রতিষ্ঠানের আয়তন অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেলে ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে জটিলতা দেখা দেয়। ভূমি, শ্রম ও মূলধনের আনুপাতিক সামঞ্জস্য বিধান এবং উৎপাদনের সকল পর্যায়েগুলো প্রত্যক্ষভাবে তত্ত্বাবধান করা সংগঠকের পক্ষে সম্ভব হয় না। অর্থাৎ নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম হলেই ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হয়।

২. অধিক ঝুঁকি: প্রতিষ্ঠানের আয়তন যত বৃদ্ধি পায় এর ঝুঁকির পরিমাণও তত বাড়ে। কাজেই অধিক ঝুঁকি বৃহদায়তন কারবার প্রতিষ্ঠানের একটি অন্যতম সমস্যা। বাজারে পণ্য মূল্য হ্রাস পেলে কিংবা চাহিদা হ্রাস পেলে বৃহদায়তনের প্রতিষ্ঠানকে বিরাট ঝুঁকির মোকাবেলা করতে হয়।

৩. প্রশিক্ষিত কর্মীর অভাব: বাংলাদেশে বৃহদায়তন এন্টারপ্রাইজের কর্মীদের প্রশিক্ষণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। দক্ষ কর্মীর অভাবে এ জাতীয় প্রতিষ্ঠান গ্রাহক সেবার মান উন্নত করতে পারছে না।

৪. মূলধন সমস্যা: বৃহদায়তন এন্টারপ্রাইজগুলোর প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন পড়ে ফলে অনেক সময় একজন মালিকের পক্ষে সমুদয় অর্থের যোগান দেওয়া সম্ভব হয় না। ফলে মূলধন স্বল্পতার কারণে উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে।

৫. কর্মীদের সাথে সম্পর্কের অভাব: মালিকের সাথে কর্মীদের সুসম্পর্ক থাকলে কর্মীরা কাজে আন্তরিক হয়। এতে অপচয় হ্রাস পায়, সামগ্রিক ব্যয় হ্রাস পায় এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানে মালিকের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধান না থাকায় কর্মীদের সাথে মালিকের সুসম্পর্ক গড়ে উঠে না।

৬. একচেটিয়া ব্যবসায়ের উৎপত্তি: ক্ষুদ্রায়নের তুলনায় বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানগুলো অধিক সুবিধা ভোগ করে বলে প্রতিযোগিতায় ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলো টিকে থাকতে পারে না। ফলে প্রতিষ্ঠানগুলো বাজারে একচেটিয়া প্রভাব বিস্তার করে। এতে সমাজে আয় ও সম্পদ বন্টনে বৈষম্য বৃহদায়তন দেখা দেয়।

৭. ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানের অভাব: ক্ষুদ্র ও মাঝারী এন্টারপ্রাইজের মত এখানে ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধান দেখা যায় না। উৎপাদনের আয়তন বৃহৎ হওয়ায় এটা সম্ভব হয় না। এতে অপচয় বাড়ে এবং সুযোগ থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে ব্যয় সংকোচন করা যায় না।

৮. দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সমস্যা: ক্ষুদ্র ও মাঝারী প্রতিষ্ঠানের মতো এখানে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা যায় না। কোম্পানির ক্ষেত্রে পরিচালনা পর্ষদ, অংশীদারীর ক্ষেত্রে অংশীদারদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতে হয় বলে বিলম্ব হয়। এছাড়া বৃহৎ আয়তন বলে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নেও জটিলতা দেখা যায়।

উপরোক্তভাবে আমরা বৃহদায়তন এন্টারপ্রাইজের সুবিধা-অসুবিধা আলোচনা করতে পারি।

৩। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নে এসএমই (SME) ফাউন্ডেশনের ভূমিকা মূল্যায়ন কর।

অথবা, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প বিকাশে এসএমই ফাউন্ডেশনের কার্যাবলি আলোচনা কর।

অথবা, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নে এসএমই (SME) ফাউন্ডেশনের ভূমিকা মূল্যায়ন কর।

উত্তরঃ ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজ বাংলাদেশে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে ইতোমধ্যেই যথেষ্ট আলোচিত খাত। সরকার এ খাতকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ এবং (SME) ফাউন্ডেশন গড়ে তুলছে। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন দাতা সংস্থার সহায়তায় বাংলাদেশ ব্যাংক তার অধীনস্থ তালিকাভুক্ত ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিভিন্ন প্রণোদনামূলক ঋণদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে।

নিচে এসএমই (SME) ফাউন্ডেশনের ভূমিকা ও কার্যাবলি আলোচনা করা হল-

১। ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠান পরিচালনা অত্যন্ত সহজ এবং পরিচালনায় কোন জটিলতা নেই।

২। মালিক ও কর্মী ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানে ব্যাপক সংখ্যায় কর্মরত থেকে অর্থ উপার্জনের সুযোগ পায় বিধায় সামাজিক পর্যায়ে কর্মচঞ্চল পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

৩। (SME) ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে বাস্তব জ্ঞান, নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে ব্যবসায় পরিচালনা করা যায়।

৪। (SME) ফাউন্ডেশন একটি উত্তম প্রতিষ্ঠান কেন্দ্র।

৫। এর মাধ্যমে ব্যক্তিগত আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে জাতীয় উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়।

৬। (SME) ফাউন্ডেশন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ অবদান রাখে।

৭। (SME) ফাউন্ডেশন ব্যবসায় ও বানিজ্যের উন্নয়নে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৮। অভিজ্ঞতা বিনিময় ক্ষেত্রে (SME) ফাউন্ডেশন বেশি সহায়তা করে থাকে।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়ন সাধন করে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে (SME) ফাউন্ডেশনের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

নিয়মিত আপডেট পেতে **HSC BMT** ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটন বাজিয়ে রাখুন

অধ্যায়-৩: পণ্য ডিজাইন ও উন্নয়ন

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর

১। পণ্য ডিজাইন কী?

উত্তর: পণ্য ডিজাইন বলতে পণ্যের কাঠামোগত বিষয় বা মান বুঝায়। কাঁচামাল প্রক্রিয়াকরণ করে চূড়ান্তকরণ করে চূড়ান্ত পণ্য তৈরি করার পূর্বে পণ্য ডিজাইনের কাজ শুরু করতে হয়। আর পণ্য ডিজাইন করার সময় ক্রেতার সম্ভ্রুতি ও প্রতিযোগিতা বিবেচনা করে পণ্য ডিজাইনে পণ্যের আকার, আকৃতি, ওজন, রং ইত্যাদি স্থির করা হয়। সাধারণত প্রতিষ্ঠানের কারিগরি বিভাগ পণ্য ডিজাইনের কাজ করে থাকে।

বিভিন্ন লেখক বিভিন্নভাবে পণ্য ডিজাইনের সংজ্ঞা দিয়েছেন,

Agarwal & Jain-এর মতে, “পণ্য ডিজাইন বলতে পণ্যের আকার, মান ও ধাঁচ নির্ধারণকে বুঝায়।”

Amico-এর মতে, “পণ্যের ডিজাইন হলো পণ্যের আকার, গঠন ও স্টাইল বা বৈশিষ্ট্য যা পণ্যের মাত্রাকে প্রভাবিত করে।”

পরিশেষে বলা যায় যে, ক্রেতার রুচি, পছন্দ, স্টাইল ও সম্ভ্রুতি বিবেচনা করে পণ্যের আকার, আকৃতি, রং, মান ইত্যাদি পণ্যটি উৎপাদনের পূর্বে নির্ধারণ করাই হলো পণ্যের ডিজাইন বা পণ্য নকশাকরণ।

২। পণ্য ডিজাইনের স্তর কয়টি ও কী কী?

উত্তর: প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে এবং ক্রেতার সম্ভ্রুতি অর্জনের লক্ষ্যে ডিজাইন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে বিবেচিত হয়। নিচে পণ্য ডিজাইনের স্তরগুলো উল্লেখ করা হলো

১।	উদ্যোগ গ্রহণ
২।	ধারণা উন্নয়ন
৩।	সামর্থ বিশ্লেষণ
৪।	পরীক্ষামূলক উৎপাদন
৫।	চূড়ান্ত উৎপাদন

৩। অ্যাসেমব্লিং কী?

উত্তর: সাধারণত কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কতিপয় ব্যক্তি একত্রিত হয়ে যে কার্যসম্পাদন করে তাকে অ্যাসেমব্লিং বলে। ব্যাপক অর্থে, উৎপাদনের সকল উপকরণ যেমন- ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন একত্রিত করে একটি নির্দিষ্ট স্থানে পাওয়া গেলে তাকে অ্যাসেমব্লিং বলে। পণ্য উৎপাদন থেকে শুরু করে ভোক্তার নিকট পণ্য পৌঁছানো পর্যন্ত সকল কার্যাবলি অ্যাসেমব্লিং এর মাধ্যমে সম্পাদিত হয়।

৪। কাস্টমাইজেশন কী?

উত্তর: বিশেষ কোন ক্রেতার ফরমায়েশ অনুযায়ী পণ্য তৈরি করা এবং সরবরাহ করাই হল কাস্টমাইজেশন। এক্ষেত্রে পণ্যের উৎপাদক তাদের নিজস্ব মান, আকার, সংখ্যা, মোড়কীকরণ ইত্যাদিকে প্রাধান্য না দিয়ে ক্রেতার চাহিদাকেই প্রাধান্য দেয়। যেমন- বিশ্বের বড় বড় গাড়ি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো কোন বিশেষ এলাকার বা কোন দেশের আমদানিকারক বা এজেন্টের ফরমায়েশ অনুযায়ী গাড়ির রং, আকার, ডিজাইন ইত্যাদিতে পরিবর্তন এনে তা সরবরাহ করে থাকে। এভাবে ক্রেতার ফরমায়েশ অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন ও বন্টন করাই হল কাস্টমাইজেশন। সাধারণত অটোমোবাইল, বড় বড় যন্ত্রপাতি তৈরি, উড়োজাহাজ তৈরি, অস্ত্র তৈরি ও সরবরাহ, ফ্যাশন হাউসের জন্য বিশেষ ধরনের পোশাক তৈরি, বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য পণ্য তৈরি প্রভৃতি কাস্টমাইজেশনের উদাহরণ।

৫। পণ্য উন্নয়ন কাকে বলে?

উত্তর: গৃহীত ধারণা বা ধারণাগুলোকে বাস্তবে রূপদানের উদ্দেশ্যে উৎপাদন বিভাগে প্রয়োজনীয় গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য পাঠানো হয় এটিই পণ্য উন্নয়ন। কারিগরি দিক হতে কোনো ত্রুটি না থাকলে এবং যে পরিমাণ উৎপাদন ব্যয় পূর্বে চিন্তা করা হয়েছে তার চাইতে বাস্তবে ব্যয় আরও বেশি হবে বলে প্রতীয়মান না হলে পণ্য উৎপাদনের জন্য উদ্যোগ নেয়া হয়। পণ্য তৈরি, পণ্যের মোড়কীকরণ, নামকরণ, পেটেন্ট নিবন্ধন ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পন্ন করে পণ্য উন্নয়ন করা হয়।

নতুন পণ্য উন্নয়ন করা বাজারজাতকরণ পরিকল্পনার একটি বড় চ্যালেঞ্জ। কোম্পানীর যে সকল পণ্য পতন স্তরে পৌঁছে গেছে সে সব পণ্যের উৎপাদন বন্ধ করে নতুন পণ্য উন্নয়ন করতে হয়। কিন্তু নতুন পণ্য উন্নয়ন সহজসাধ্য নয়। নতুন পণ্য উন্নয়নের জন্য প্রতিষ্ঠানকে কতগুলো পদক্ষেপের মাধ্যমে অগ্রসর হতে হয়।

নতুন পণ্য উন্নয়ন প্রক্রিয়া ৬টি ধাপে সম্পন্ন করা হয়ঃ

- ১। নতুন পণ্য সংক্রান্ত ধারণা সৃষ্টি
- ২। ধারণাসমূহের বাছাই
- ৩। ব্যবসায়িক বিশ্লেষণ
- ৪। পণ্য উন্নয়ন
- ৫। বাণিজ্যিকীকরণ
- ৬। পরীক্ষামূলক বিবরণ

এই সাজেশনটি “HSC BMT/এইচএসসি বিএমটি”
ইউটিউব চ্যানেল ব্যতীত অন্য কোন চ্যানেল বা পেইজ
থেকে নিলে আপনি প্রতারিত হতে পারেন।

তাই বলা যায়, পণ্য সংক্রান্ত গবেষণা প্রকৌশলিক ও পণ্যের ডিজাইন বিষয়ক কারিগরি কার্যাবলিকে পণ্য উন্নয়ন বলে।

রচনামূলক প্রশ্ন উত্তর

১। পণ্য ডিজাইনের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।

উত্তর: পণ্য ডিজাইনের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা: ক্রেতা বা ভোক্তাদের রুচি, পছন্দ, ক্রয় অভ্যাস ইত্যাদি পরিবর্তনের ফলে একদিকে যেমন উৎপাদকরা তাদের উৎপাদিত পণ্যের ডিজাইন পরিবর্তন করতে বাধ্য হয় অন্যদিকে তেমনি প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্যও পণ্যের আধুনিক ডিজাইন করার প্রয়োজন হয়। নিম্নে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পণ্য ডিজাইনের গুরুত্ব আলোচনা করা হলো-

১. আকর্ষণ সৃষ্টি: পণ্য ডিজাইনের মাধ্যমে পণ্যটির আকার, আকৃতি, ওজন, অলংকরণ ইত্যাদি ক্রেতার নিকট সবচেয়ে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করা হয়। যা পণ্যের চাহিদা, গ্রহণযোগ্যতা ও বিক্রয় বৃদ্ধিতে ব্যাপকভাবে সহায়তা করে।

২. উৎপাদন ব্যয় হ্রাস : পণ্য ডিজাইনের মাধ্যমে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন করে উৎপাদন উপকরণের অপচয় হ্রাস ও দ্রুততার সাথে উৎপাদন কার্য সম্পাদন করা সম্ভব হয়। এর ফলে একক প্রতি উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করা সম্ভব যা প্রতিযোগিতাপূর্ণ বাজারে টিকে থাকার জন্য অপরিহার্য।

৩. ভোক্তাদের রুচির পরিবর্তন: সময়ের সাথে সাথে ভোক্তার চাহিদা ও রুচির পরিবর্তন ঘটে। আর ভোক্তার এই পরিবর্তনশীল রুচির সন্তুষ্টি বিধানের জন্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের পণ্য দ্রব্য নিয়মিত নতুন নতুন ডিজাইনে রূপান্তর করে।

৪. প্রযুক্তিগত পরিবর্তন: বর্তমানে প্রযুক্তি খুব দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। নতুন প্রযুক্তি বিভিন্ন উপযোগ সৃষ্টি করে যার ফলে পণ্যের মান উন্নত হচ্ছে। আর ভোক্তারাও নিত্য নতুন প্রযুক্তিসম্পন্ন পণ্য ক্রয় করার জন্য উৎসাহী থাকে। এই কারণে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান নতুন প্রযুক্তির সাথে সামঞ্জস্য রেখে পণ্য ডিজাইন করে।

৫. প্রতিযোগিতা মোকাবেলা: উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে তীব্র প্রতিযোগিতা মোকাবেলা করে পণ্য বাজারজাত করতে হয়। এই কারণে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান প্রতিযোগি প্রতিষ্ঠানের পণ্য অপেক্ষা আকর্ষণীয় ও মানসম্পন্ন পণ্য বাজারে নিয়ে আসে যেন অধিক বিক্রয় হয় ও প্রতিষ্ঠান লাভজনক অবস্থায় আসে।

৬. অনুগত ক্রেতাদের ধরে রাখা: কোনো প্রতিষ্ঠানের পণ্য ব্যবহার করে ক্রেতা উচ্চমাত্রায় সন্তুষ্ট হলে ক্রেতা সেই প্রতিষ্ঠানের পণ্য বার বার ক্রয় করে। আবার ক্রেতা যদি মনে করে যে প্রতিযোগি পণ্য তাকে আরো বেশি সন্তুষ্ট দিবে, তাহলে সে প্রতিযোগি পণ্য ক্রয় করবে। তাই উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে নিয়মিত পণ্য ডিজাইন করে ক্রেতাদের ধরে রাখতে হয়।

৭. নতুন সুযোগ সৃষ্টি: নতুন পণ্য বা ডিজাইন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে নতুন সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। যেমন- বর্তমানে ভোক্তারা পরিবেশের ব্যাপারে সচেতন। পরিবেশের ক্ষতি করে এমন পণ্যের ভিড়ে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান পণ্যের ডিজাইন পরিবর্তন ও উন্নয়ন করে পরিবেশবান্ধব পণ্য বাজারে নিয়ে আসলে তা প্রতিষ্ঠানের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করবে।

৮. সুনাম সৃষ্টি ও রক্ষা করা: পণ্য ডিজাইন ভোক্তাদের মাঝে পণ্য ও প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সুনাম সৃষ্টি করতে ও তা ধরে রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নতুন নতুন ডিজাইনের মাধ্যমে ভোক্তাদেরকে উন্নতমানের পণ্য অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে সরবরাহ করা সম্ভব হয়। আবার ক্রেতাদের রুচি ও প্রয়োজন অনুযায়ী পণ্যের মান উন্নয়ন ও পণ্যের বৈশিষ্ট্য সংযোজনের মাধ্যমে পণ্য ও প্রতিষ্ঠানের কষ্টার্জিত সুনাম ধরে রাখা সম্ভব হয়।

৯. পণ্যের জীবন-চক্র মোকাবেলা: প্রতিটি পণ্য জীবন চক্রের ধারাবাহিক বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে পরিচালিত হয়। যদি পণ্য জীবন চক্রের ধাপগুলো দ্রুত অতিক্রম করে তাহলে জীবন চক্রের শেষ পর্যায়ে পণ্য পর্যাণ্ড মুনাফা অর্জন করতে পারে না। তাই পণ্যের জীবন চক্রকে মোকাবেলা করার জন্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে নতুন পণ্য ডিজাইন বা বিদ্যমান পণ্যের ডিজাইনে উন্নয়ন করতে হয়।

১০. সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার: নতুন পণ্য ডিজাইন বা বিদ্যমান পণ্যের ডিজাইন উন্নয়ন ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান তার সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে পারে। এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান তার মূলধন, যন্ত্রপাতি, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারে।

উপরোক্তভাবে আমরা পণ্য ডিজাইনের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করতে পারি।

২। পণ্য ডিজাইনের বিবেচ্য বিষয়সমূহ আলোচনা কর।

উত্তর : বর্তমান প্রতিযোগিতাপূর্ণ ব্যবসায়িক জগতে বাজারে টিকে থাকতে হলে উন্নত মানের পণ্য বা সেবার বিকল্প নেই। পণ্য মানের পাশাপাশি এর ডিজাইনও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ পণ্যের মান যতই ভালো হোক না কেন তার ডিজাইন যদি ক্রেতার পছন্দ না করে তবে তা ক্রেতাদের মাঝে সাড়া জাগাতে ব্যর্থ হবে। পণ্যের ডিজাইন নির্ধারণের সময় বেশ কিছু বিষয়কে বিবেচনা করতে হয়। পণ্য বা সেবা ডিজাইনের ক্ষেত্রে যে-সকল বিষয়কে বিবেচনা করা হয় নিম্নে তা আলোচনা করা হলো-

১। ক্রেতাদের চাহিদা : পণ্য বা সেবা ডিজাইনের মূল উদ্দেশ্য হলো ক্রেতাদের চাহিদা পূরণ করা। ক্রেতার কোন ধরনের পণ্য চায়, তা জানতে না পারলে সঠিকভাবে পণ্য ডিজাইন করা যায় না। তাই ক্রেতাদের কাক্ষিত চাহিদা যাতে পূরণ হয় সে বিষয়টি বিবেচনা করে পণ্যের ডিজাইন করা উচিত।

২। অপারেশনের সুবিধা: ক্রেতাদের চাহিদার পাশাপাশি ডিজাইনকৃত পণ্যটি যাতে অতি সহজেই উৎপাদন করা যায়, সে বিষয়টির দিকেও খেয়াল রাখা প্রয়োজন। কারণ ডিজাইন যতই সুন্দর ও কাক্ষিত মাত্রার হোক না কেন তা যদি অপারেশনে ব্যাপক সমস্যার সৃষ্টি করে তবে তা পরিহার করা উচিত।

৩। কার্যকারিতা : পণ্য ডিজাইনের সাথে দু'টি বিষয় জড়িত। এর একটি হলো পণ্যের অভ্যন্তরীণ বিষয় এবং অন্যটি হলো এর বহিরাবরণ। অভ্যন্তরীণ বিষয় বলতে এর গুণাগুণ বা কার্যকারিতাকে বুঝানো হয়। পণ্য ডিজাইনের ক্ষেত্রে এর উপযোগিতা ও অভাব পূরণের ক্ষমতার দিকে বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করা উচিত। কারণ শুধুমাত্র উন্নত উপায়ে পণ্য উপস্থাপন করলেই হবে না, তা অভাব পূরণের উপযুক্তও হতে হবে।

৪। ব্যয় : বর্তমান যুগ প্রতিযোগিতার যুগ। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার অন্যতম শর্ত হলো- তুলনামূলক কম ব্যয়ে উন্নতমানের পণ্য ক্রেতাদেরকে সরবরাহ করা। তাই ডিজাইনের নামে এমন অব্যবহৃত ব্যয় করা যাবে না, যা পণ্যের ব্যয় অত্যধিক মাত্রায় বৃদ্ধি করে। কারণ পণ্যের ব্যয় বেশি হলে তা ক্রেতাদের আকৃষ্ট করতে নাও পারে।

৫। স্টাইল পরিবর্তনের প্রবণতা : পণ্য ডিজাইনের সময় প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান পদ্ধতি ও যন্ত্রপাতিকেও বিবেচনা করা প্রয়োজন। কারণ বর্তমান সুযোগ-সুবিধার মধ্যে থেকেই পণ্যের ডিজাইন করা উচিত। পণ্য ডিজাইন করতে গিয়ে যদি বর্তমান পদ্ধতি ও যন্ত্রপাতি সম্প্রসারণের প্রয়োজন পড়ে, তবে তা প্রতিষ্ঠানের সামর্থ্যের বাইরে চলে যেতে পারে।

৬। স্টাইল পরিবর্তনের প্রবণতা: আধুনিক যুগে ক্রেতাদের রুচি, আচার-আচরণ, ফ্যাশন ইত্যাদি দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। কোনো কোনো পণ্যের ক্ষেত্রে এর প্রবণতা আরো বেশি। তাই যে-সকল পণ্যের স্টাইল দ্রুত পরিবর্তন হয় সেগুলোর ক্ষেত্রে বেশ চিন্তাভাবনা করেই ডিজাইন প্রণয়ন করা উচিত। কারণ পণ্যের ডিজাইন বার বার পরিবর্তন করলে সাধারণ ক্রেতাদের উপর তার ঋণাত্মক প্রভাব পড়ে।

৭। স্টাইল সম্পর্কিত বাধা: পণ্যের স্টাইল পরিবর্তনে বেশ কিছু বিষয় বাধার সৃষ্টি করে। এগুলোর অন্যতম হলো- ক্রেতা অসন্তুষ্টি, প্রযুক্তিগত বাধা, আর্থিক অসামর্থ্যতা, জনবলের সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি। তাই পণ্যের স্টাইল পরিবর্তনের সময় এ সকল বাধা আছে কি না বা বাধা থাকলেও তা দূর করার মতো সামর্থ্য প্রতিষ্ঠানের আছে কি না তা ভেবে দেখা উচিত।

৮। ক্রয় ক্ষমতা: পণ্য ডিজাইনের ক্ষেত্রে ক্রেতাদের ক্রয় ক্ষমতাকে বিশেষভাবে বিবেচনা করা উচিত। পণ্য উৎপাদন করা হয় ক্রেতাদের জন্যই। কিন্তু ডিজাইন করতে গিয়ে পণ্যের মূল্য যদি এতো বেশি বৃদ্ধি পায় যে, পণ্যটি তাদের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যায়, তবে তারা ঐ পণ্য আর ক্রয় করবে না। এতে পণ্য ডিজাইনের মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে।

৯। গ্রহণযোগ্যতা: ডিজাইনকৃত পণ্যটি যাতে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। ডিজাইনকৃত পণ্যটি একদিকে যেমন ক্রেতাদের মধ্যে গ্রহণযোগ্য হতে হবে, অন্যদিকে তেমনি প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তির দিকেও খেয়াল রাখতে হবে। তা ছাড়া সমাজ, ধর্ম এবং সরকারের কাছেও তার যেন গ্রহণযোগ্যতা থাকে সে দিকে খেয়াল রেখে পণ্যের ডিজাইন করা উচিত।

১০। স্থায়িত্ব: পণ্য ডিজাইন করার ক্ষেত্রে এর স্থায়িত্বের বিষয়টিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। কারণ ঘন ঘন ডিজাইন পরিবর্তন করা হলে একদিকে যেমন পণ্যের উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে পণ্য মূল্য বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে তেমনি প্রতিষ্ঠানের সুনামের উপরও তার ঋণাত্মক প্রভাব পড়ে। তাই ডিজাইনের ক্ষেত্রে এর স্থায়িত্বের বিষয়টি মাথায় রেখেই পণ্য বা সেবার ডিজাইন করা উচিত।

১১। আকর্ষণীয়তা: পণ্য ডিজাইন করার সময় পণ্যের আকর্ষণীয়তার দিকটি বিবেচনায় রাখা উচিত। কারণ পণ্য ডিজাইনে পণ্যের আকার, আকৃতি, অলংকার ইত্যাদি ঠিক করা হয়। এতে পণ্যটি ক্রেতাদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। আর আকর্ষণীয় ডিজাইন খুব সহজেই ক্রেতারা কিনতে আগ্রহী হয়।

১২। প্রতিযোগিতা : বর্তমানে প্রতিটি কোম্পানি তীব্র প্রতিযোগিতা মোকাবেলা করেই বাজারে টিকে থাকে। যেমন- সাবান, শ্যাম্পু, টুথপেস্ট, ডিটারজেন্ট, বিস্কুটসহ অনেক পণ্যেই তীব্র প্রতিযোগিতা বিদ্যমান। তাই প্রতিযোগী কোম্পানির পণ্য ডিজাইনের বিষয়টি মাথায় রেখে পণ্যের ডিজাইন করতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, পণ্য ডিজাইন করা একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তবে পণ্য ডিজাইন যেহেতু একটি স্পর্শকাতর বিষয়, তাই যেনতেনভাবে তা করা উচিত নয়। তাই একজন ডিজাইনারকে পণ্য ডিজাইন করার ক্ষেত্রে যে-সকল বিষয় বিবেচনা করতে হয় তা উপরে আলোচনা করা হয়েছে। যদি প্রয়োজন হয় তবে এ বিষয়গুলোর বাইরেও আরো অনেক বিষয় আছে যেগুলোকে পণ্য ডিজাইনের ক্ষেত্রে বিবেচনা করা যেতে পারে।

৩। পণ্যের মান নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ বর্ণনা কর।

অথবা, পণ্যের মান নির্ধারণের ক্ষেত্রে কী কী প্রক্রিয়া বা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়? বর্ণনা কর।

উত্তর: মান নির্ধারণ মান ব্যবস্থাপনার একটি অন্যতম কাজ। এ কাজটি সম্পাদনের জন্য ব্যবস্থাপককে একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয়। নিচে মান নির্ধারণের এ প্রক্রিয়া বা মান নির্ধারণের পদক্ষেপ আলোচনা করা হলো:-

১। ক্রেতা মূল্যায়ন : পণ্য বা সেবার মান নির্ধারণের মূল উদ্দেশ্য হলো ক্রেতাদের প্রত্যাশা পূরণ। তাই ক্রেতাসাধারণ কোন ধরনের বা কোন মানের পণ্য প্রত্যাশা করে সে বিষয়টি সম্পর্কে সর্বপ্রথম নিশ্চিত হতে হবে। এক্ষেত্রে ক্রেতার ধরন, তাদের সামাজিক অবস্থান, তাদের ক্রয় অভ্যাস ইত্যাদিকে বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়। ক্রেতা মূল্যায়নের পাশাপাশি এক্ষেত্রে প্রতিযোগী পণ্যের মানকেও বিশেষভাবে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন।

২। সুযোগ-সুবিধা মূল্যায়ন : ক্রেতা মূল্যায়নের পর প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধাকে মূল্যায়ন করতে হবে। অর্থাৎ, সম্ভাব্য মানের পণ্য উৎপাদনে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রতিষ্ঠানে আছে কি না তা দেখা হবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, মেশিনপত্র, জনশক্তি, পদ্ধতি ইত্যাদি পর্যাণ্ড পরিমাণে আছে কি না তা মূল্যায়ন করে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। যদি এ সকল উপকরণের ঘাটতি থাকে তা হলে তা সংগ্রহের ব্যবস্থা করা উচিত।

৩। পরীক্ষামূলক মান নির্ধারণ : প্রতিষ্ঠানের সুযোগ-সুবিধা মূল্যায়নের পর যদি তা ক্রেতাদের প্রত্যাশিত মানের পণ্য উৎপাদনের সহায়ক হয়, তাহলে এ পর্যায়ে পরীক্ষামূলকভাবে পণ্য বা সেবার মান অস্থায়ী ভিত্তিতে নির্ধারণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে ক্রেতাদের প্রত্যাশা পূরণের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কয়েকটি বিকল্প মান নির্ধারণ করা যেতে পারে। বিকল্প মানের ক্ষেত্রে ক্রেতাদের আর্থিক অবস্থা, তাদের রুচি ও অভ্যাসের প্রবণতা, তাদের ক্রয় অভ্যাস ইত্যাদিকে বিবেচনা করতে হয়।

৪। নির্ধারিত মানের প্রচার : পরীক্ষামূলক নির্ধারিত মান ক্রেতাদেরকে জানানোর জন্য এক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের প্রচার কার্য চালানো হয়। প্রচারের জন্য সীমিত পর্যায়ে পণ্য বিক্রয় করা যেতে পারে অথবা ইলেক্ট্রনিক্স বা প্রিন্ট মিডিয়াকেও ব্যবহার করা যেতে পারে। আমাদের দেশে মোবাইল ফোন অপারেটররা বিভিন্ন প্যাকেজ অফার দিয়ে তাদের সেবা সম্পর্কে গ্রাহকদের ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করে।

৫। গ্রহণযোগ্যতা নিরূপণ : পরীক্ষামূলক নির্ধারিত মান প্রচার করার পর সে সম্পর্কে ক্রেতাদের মনোভাব কেমন, তা এ পর্যায়ে জানার চেষ্টা করা হয়। বড় বড় কোম্পানিগুলো তাদের বিক্রয়ের প্রবৃদ্ধি দেখে অথবা বিক্রয় কর্মীদের সাহায্যে বাজার থেকে ক্রেতাদের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে। ক্রেতাসাধারণ যদি এক্ষেত্রে মানের কোনোরূপ সংশোধনের পরামর্শ দেয় তাহলে তা বিবেচনা করে তবেই চূড়ান্তভাবে মান নির্ধারণ করা উত্তম।

৬। চূড়ান্ত মান নির্ধারণ : ক্রেতাদের মতামত পাওয়ার পর যদি কোনো সংশোধনী থাকে তাহলে তা সংশোধন করে চূড়ান্ত মান নির্ধারণ করা হলে পণ্য বা সেবার মান নির্ধারণের সর্বশেষ ধাপ। এ পর্যায়ে মান ব্যবস্থাপক প্রয়োজনীয় সংশোধন সাপেক্ষে পণ্য বা সেবার মান নির্ধারণ করে এবং নির্ধারিত মান অনুযায়ী পণ্য বা সেবা উৎপাদনের জন্য স্থায়ীভাবে মেশিনপত্র, কার্যপদ্ধতি, জনশক্তি ইত্যাদি স্থাপন করেন।

পরিশেষে বলা যায়, উপরিউক্ত পদক্ষেপগুলো অনুসরণ করে পণ্য বা সেবার মান নির্ধারণ করা হলেও তা দীর্ঘদিন টিকে থাকবে তা নয়। কারণ ক্রেতাদের রুচি, অভ্যাস, ক্রয়ক্ষমতা ইত্যাদি পরিবর্তন হওয়ার সাথে সাথে পণ্য বা সেবার মানের পরিবর্তন আনা আবশ্যিক। তাই মান ব্যবস্থাপককে সর্বদা এ বিষয়গুলোর দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয়।

৪। নতুন পণ্য উন্নয়নের বিবেচ্য বিষয়সমূহ কী কী? আলোচনা কর।

উত্তর: নতুন পণ্য উন্নয়নের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ যে কোন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রতিষ্ঠানের পণ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কোনো নতুন পণ্য উৎপাদনে ঝুঁকির পরিমাণ কিছুটা হলেও একেবারে নতুন পণ্য উন্নয়নের ক্ষেত্রে তা ভিন্নতর। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ ও সতর্ক বিশ্লেষণের প্রয়োজন পড়ে। নিচে নতুন পণ্য উন্নয়নের বিবেচ্য বিষয়সমূহ তুলে ধরা হলো:-

১। ক্রেতা বা ভোক্তার বিবেচনা:

ক. ক্রেতাদের ধরণ অর্থাৎ তারা সমাজের কোন শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।

খ. ক্রেতাদের আর্থিক সামর্থ্য অর্থাৎ তারা পণ্যের জন্য কী পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে পারবে।

গ. ক্রেতাদের ক্রয়-আচরণ অর্থাৎ তারা কখন, কীভাবে কী পরিমাণ পণ্য কিনবে এবং

ঘ. ক্রেতাদের রুচি বা পছন্দ কতদিন পর্যন্ত স্থায়ী থাকবে।

২। পণ্য বিপণন সংক্রান্ত বিবেচনা:

ক. ক্রেতা বা ভোক্তাদের নিকট পণ্যের পরিচিত করতে কোন ধরনের বাজারজাতকরণ প্রসার কৌশল; অর্থাৎ বিজ্ঞাপন ও বিক্রয় প্রসারের কোন্ কোন্ পন্থাসমূহ অধিক উপযোগী হবে

(খ) বাজারজাতকরণ প্রসারের ব্যয় কেমন আসবে এবং তা সম্ভাব্য বাজারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে কি না;

(গ) পণ্য বাজারজাতকরণে কোন ধরনের বটন প্রণালির ব্যবহার লাভজনক হবে;

(ঘ) পণ্য বাজারজাতকরণ কৌশল কী হবে অর্থাৎ পণ্যমূল্য কম রেখে, প্রসারমূলক কাজ বাড়িয়ে, জিনিসের মান উন্নত করে অথবা অন্য কোন উপায়ে বাজার দখল করা যাবে;

৩। প্রতিযোগী বিবেচনা :

(ক) যে নতুন পণ্য উন্নয়ন পরিকল্পনা নেয়া হচ্ছে ঐ ধরনের পণ্য বাজারে কে বা কারা উৎপাদন করছে ও তাদের সাফল্যে উৎপাদনের পরিমাণ কত এবং বাজার চাহিদার কত অংশ তারা উৎপাদন করছে;

(খ) ঐ ধরনের পণ্য বিদেশ হতে আমদানি হচ্ছে কিনা এবং দেশের বাজারে তার প্রভাব কেমন;

(গ) দেশীয় উৎপাদক বা আমদানিকারক বাজারে উক্ত পণ্য বিপণনে কী কী কৌশল ব্যবহার করছে;

- (ঘ) দেশীয় বাজারে প্রতিযোগী যে সকল পণ্য বিক্রয় হচ্ছে তাদের মান কেমন এবং মূল্য কত;
- (ঙ) প্রতিযোগীরা পণ্য বাজারজাতকরণে কোন ধরনের বটন প্রণালি ব্যবহার করছে। এক্ষেত্রে অধিক সুবিধাজনক আর কোনো বটন প্রণালি ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে কি না;
- ৪। প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব বিষয় বিবেচনা :
- (ক) প্রস্তাবিত পণ্যটি কী উৎপাদিত পণ্য রাখার সাথে সংগতিপূর্ণ না নতুন ধরনের; সংগতিপূর্ণ হলে তার উৎপাদনে ও বিপণনে বিদ্যমান সুবিধা কতটুকু কাজে লাগানো যাবে;
- (খ) নতুন ধরনের পণ্য সাফল্যের সাথে উৎপাদন ও বিপণনে কী পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে এবং সেই পরিমাণ বিনিয়োগ সামর্থ্য প্রতিষ্ঠানের রয়েছে কি না;
- (গ) নতুন পণ্য উৎপাদন ও বিপণনের জন্য ব্যবস্থাপনার ওপর যে বাড়তি চাপ পড়বে তা পূরণের মতো ব্যবস্থাপনার সামর্থ্য প্রতিষ্ঠানের আছে কি না, না থাকলে তা কীভাবে সংগ্রহ হবে;
- (ঘ) উক্ত পণ্য উৎপাদন ও বিপণনে নতুন প্রযুক্তি, যন্ত্রপাতি, দালানকোঠা, আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা কী প্রয়োজন হবে এবং এগুলো যোগাড় করা যাবে কি না;
- (ঙ) উৎপাদিত পণ্য কার্যকরভাবে বাজারজাতকরণে কী পরিমাণ সময় লাগবে। এ সময় পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানকে সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে নেয়ার মতো সামর্থ্য প্রতিষ্ঠানের থাকবে কি না;
- ৫। পরিবেশ বিবেচনা:
- ক. প্রস্তাবিত পণ্য সামাজিকভাবে কতটুকু গ্রহণযোগ্য হবে অর্থাৎ দেশের সমাজ ও সংস্কৃতি এ পণ্য তার ফ্যাশন-ডিজাইনকে কতটুকু গ্রহণ করবে;
- খ. ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ঐ পণ্যের উৎপাদনে ও বিপণনে কোনো সমস্যা রয়েছে কি না;
- গ. দেশের রাজনৈতিক ও পরিবেশ পণ্য উৎপাদন ও বিপণনে কোনো সমস্যা হয়ে দেখা দিবে কিনা;
- পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে নতুন পণ্য উন্নয়নের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পর্কে জানতে পারি।

অধ্যায়-০৪: ব্যবসায়ের অবস্থান

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর

১। ব্যবসায়ের অবস্থান বলতে কী বুঝ?

উত্তর: সাধারণত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যে স্থানে স্থাপন করা হয় বা যে স্থান থেকে ব্যবসায় কার্যাবলী পরিচালিত হয় তাকে ব্যবসায়ের অবস্থান বলা হয়। একটি ব্যবসা কতটা সাফল্য পাবে তা অনেকাংশে তার অবস্থানের উপর নির্ভরশীল।

Agarwal and Jain-এর মতে, “ব্যবসায়/কারখানার অবস্থান বলতে এমন একটি উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করাকে বুঝায় যেখান থেকে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি তার ব্যবসায়িক কার্যক্রম বা কর্মকান্ড পরিচালনা শুরু করবে।”

সোয়েল ও গুপ্ত-এর মতে, “ব্যবসায়/কারখানা অবস্থান বলতে কোনো বিশেষ ব্যবসায়/শিল্প ইউনিট স্থাপন করাকে বুঝায়।”

অধ্যাপক রবার্টসন-এর মতে, “শিল্পের অবস্থান বলতে কোন বিশেষ শিল্পের বিশেষ স্থানে পুঞ্জীভূত হওয়াকে বুঝায়।”

পরিশেষে বলা যায় যে, ব্যবসায়ের অবস্থান হচ্ছে উপযুক্ত স্থান নির্ধারণ করে ব্যবসায় স্থাপন ও পরিচালনা করা।

২। ব্যবসায়ের অবস্থান কত প্রকার ও কী কী? ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: প্রত্যেকটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আকার-আকৃতি ও কার্যাবলী একরকম নয়। বৃহদায়তনের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তার কাজ এক স্থানে এবং প্রশাসনিক কাজ অন্যত্র সম্পাদন করে। তবে মাঝারি বা ক্ষুদ্রায়তনের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তার সকল কার্যাবলী একই স্থানে থেকে সম্পাদন করে থাকে। ব্যবসায়ের অবস্থান বলতে এর গঠন ও পরিচালনার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট স্থানকে বুঝায়। ব্যবসায়ের আকৃতি, আয়তন, উপাদান এবং বৈশিষ্ট্যের আলোকে এর অবস্থানকে নিম্নোক্ত শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়-

১। শহুরে অবস্থান, ২। গ্রাম্য অবস্থান এবং ৩। শিল্প এলাকায় অবস্থান

১। শহুরে অবস্থান : যেসব ব্যবসায় সংগঠন শহর এলাকায় সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে গড়ে ওঠে, তাকে শহুরে অবস্থান বলে।

২। গ্রাম্য অবস্থান : যেসব ব্যবসায় সংগঠন অনেকক্ষেত্রে গ্রামের কোনো নির্দিষ্ট স্থানে গড়ে ওঠে, ঐ নির্দিষ্ট স্থানকেই গ্রাম্য অবস্থান বলে।

৩। শিল্প এলাকায় অবস্থান : মাঝে মাঝে সাধারণত আকৃতি অনুযায়ী এমন কিছু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান আছে, যা শিল্প এলাকাতেই গড়ে ওঠে।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, ব্যবসায়ের ধরন কী হবে তার উপর বিবেচনা করেই উপরিউক্ত স্থানে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।

৩। ব্যবসায়ের আয়তন কী?

উত্তর: ব্যবসায়ের আয়তন : ব্যবসায় জগতে বিভিন্ন আয়তনের প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এসব ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বৃহৎ, মাঝারি এবং ছোট আয়তনের হয়ে থাকে। এ বিভিন্ন আকৃতির প্রতিষ্ঠানকে ব্যবসায়ের আয়তন বলে। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কোনটির আয়তন কীরূপ হবে তা কতকগুলো পরিমাপক দ্বারা নির্ধারণ করা যায়। মূলত, শিল্পের আকৃতি ও উৎপাদিত দ্রব্যের বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে পরিমাপক ব্যবহার করা হয়।

৪। কোন কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গ্রাম অঞ্চলে গড়ে উঠে?

উত্তর: ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান শহরে, গ্রামে উভয় স্থানে গড়ে উঠতে পারে। এমন কতকগুলো ব্যবসায় আছে যেগুলো বৈশিষ্ট্যগত কারণে কেবল গ্রাম্য এলাকাতেই স্থাপিত হয়ে থাকে। যেমন-চিনিকল, ইটের ভাটা, হস্তজাত ও কুটিরশিল্প, কাঁচামালের ব্যবসা যেমন- ধান, পাট, আলু ইত্যাদি। এসব শিল্পকারখানা ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ গ্রামে স্থাপন করাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত ও লাভজনক। উন্নত যোগাযোগের উপর নির্ভর করে গ্রাম অঞ্চলের ব্যবসায় বাণিজ্য গড়ে উঠতে পারে।

৫। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে শহরের অবস্থান কেন বিবেচনা করা হয়?

উত্তর: সাধারণত শহর বা তার উপকণ্ঠে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও শিল্পকারখানা বহুকাল থেকেই স্থাপিত হয়ে আসছে। বহুবিধ সুযোগ-সুবিধার জন্য শহর এলাকাকে ব্যবসায়ের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তা ছাড়া এমন কিছু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আছে যেগুলো এদের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যগত কারণে আবশ্যিকভাবেই কেবল শহর এলাকাতে গড়ে ওঠে, যেমন- ছাপাখানা, মোটরগাড়ি ক্রয়-বিক্রয় ও এদের খুচরা যন্ত্রাংশের ব্যবসা, শিল্পপণ্যের ব্যবসা, আমদানি ও রপ্তানি পণ্যের ব্যবসায়, বিভাগীয় বিপণি, ভোগ্যপণ্যের পাইকারি ব্যবসায়, কার্পেট ও আসবাবপত্রের ব্যবসায়, ব্যাংক ও বিমা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি শহর এলাকাতেই সাধারণত প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে।

নিয়মিত আপডেট পেতে HSC BMT ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটন বাজিয়ে রাখুন

রচনামূলক প্রশ্ন উত্তর

১। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অবস্থান নির্ধারণের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা/সুবিধা আলোচনা কর।

উত্তর: ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অবস্থানের উপর যে কোন ব্যবসায়ের সফলতা বা ব্যর্থতা নির্ভর করে থাকে। তাই ব্যবসায়ের অবস্থান নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। নিম্নে ব্যবসায়ের অবস্থান নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

১। বিক্রয় ও মুনাফা বৃদ্ধি: যথাস্থানে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সম্ভব হলে বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং ব্যবসায় মুনাফার পরিমাণ বাড়ে। পণ্যের প্রকৃতি অনুযায়ী ক্রেতারা সুবিধাজনক স্থান থেকে পণ্য পাওয়ার প্রত্যাশা করে। যেমন- চাল, ডাল, তেল, সাবান, বিস্কুট, চকলেট ইত্যাদি পণ্য ক্রেতারা হাতের নাগালের মধ্যে পাওয়ার প্রত্যাশা করে। তাই মহল্লায় ঢুকতে রাস্তার মোড়ে সাধারণত এরূপ পণ্যের ব্যবসায় গড়ে তোলা হয়।

২। ক্রেতা সন্তুষ্টি বিধান: ক্রেতা সন্তুষ্টি অর্জনের উপর ব্যবসায়িক সাফল্য নির্ভর করে। আর ব্যবসায়ের যথাযথ অবস্থান ক্রেতা সন্তুষ্টি বিধান সহায়ক। গ্রামের বাজারে ঢুকতে চায়ের দোকান লক্ষ করা যায়। কারণ ক্রেতারা বাজারে ঢোকান আগে বা পরে দোকানে বসে একটু চা খেয়ে গল্পগুজব করতে পছন্দ করে।

৩। সাফল্য লাভের অধিক সম্ভাবনা : ব্যবসায় সফলতা অর্জনে একদিকে যেমন দক্ষ পরিচালনা, উপযুক্ত পুঁজি, দক্ষ কর্মী ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ অন্যদিকে তেমনি যথাযথ অবস্থান নির্ণয় আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। যথাযথ অবস্থানে (Market place)-এ ব্যবসায় গড়ে তুলতে না পারলে হাজারো চেষ্টা করেও ব্যবসায় ভালো করা যায় না।

৪। বাজারজাতকরণ সুবিধা: ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অবস্থান এমন স্থানে হবে যেখানে বাজারজাতকরণ সহজ হয়। ব্যবসায়ের অবস্থানটি বাজার বা ক্রেতাদের কাছাকাছি হলে কম ব্যয়ে ও সহজে পণ্য বাজারজাতকরণ করা যায়। ফলে ক্রেতাদের সন্তুষ্টি করা সহজ হয়।

৫। প্রতিযোগিতা মোকাবেলা: ব্যবসার অবস্থানটি উপযুক্ত স্থানে হলে কম খরচে পণ্য উৎপাদন ও বিপণন করা সম্ভব হয়, ফলে পণ্যের মূল্য কম ধরে ক্রেতাকে আকৃষ্ট করা যায়। এভাবে প্রতিযোগিতা মোকাবেলা করা যায়।

৬। স্থানীয়করণের সুবিধা অর্জন: ব্যবসায় স্থানীয়করণের বড় সুবিধা হলো একই স্থানে বিভিন্ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের উপস্থিতি থাকায় ব্যবসায় পরিচালনা সুবিধা হয়। ঢাকা শহরের আশে-পাশে শ্রমিক থেকে শুরু করে প্রাতিষ্ঠানিক বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা বজায় থাকার কারণে গার্মেন্টস শিল্প গড়ে উঠেছে।

৭। অবকাঠামোগত সুবিধা লাভ: কার্যকর ব্যবসায় অবস্থান অবকাঠামোগত সুবিধা অর্জনেও ব্যবসায়কে সহায়তা করে। বিশেষ শিল্প এলাকায় শিল্প গঠনে অনেকের উৎসাহিত হওয়ার পিছনে বড় কারণ হলো- অবকাঠামোগত সুবিধা। গ্যাস, বিদ্যুৎ, জায়গা, রাস্তাঘাট ইত্যাদি অবকাঠামোগত সুবিধা এখানে পাওয়া যায়।

৮। উন্নত পরিবহন সুবিধা : উন্নত পরিবহন ব্যবস্থার মাধ্যমে কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্যদ্রব্য সহজেই আনা-নেয়া করা সম্ভব। আর এই অনুকূল অবস্থানের জন্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে অতি সহজেই অগ্রগতি সাধিত হয়। ব্যবসায়ের উন্নতি সাধনের জন্য যোগাযোগের এ সহজলভ্যতার বিষয়টি নির্বাচন করা হয়। তাই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অবস্থান কোথায় হওয়া উচিত তা পূর্ব থেকেই নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

৯। প্রয়োজনীয় উপকরণের সহজপ্রাপ্তি : শিল্পকারখানা স্থাপনের জন্য পানি, বিদ্যুৎ, কয়লা, গ্যাস ইত্যাদির সহজপ্রাপ্যতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এসব উপাদান ছাড়া শিল্পকারখানা স্থাপন ও পরিচালনা সম্ভব নয়। এগুলোর সহজপ্রাপ্তি কোন স্থানে রয়েছে সেটি বিবেচনা করে শিল্পকারখানা স্থাপন করা হয়, যাতে সহজেই ঐ শিল্পকারখানায় উন্নতি লাভ করা যায়। তাই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সফলতা লাভের পূর্বশর্ত হলো ব্যবসায়ের অবস্থান নির্ধারণ করা।

১০। পরিচালনা ব্যয় সহজ : পরিচালনা ব্যয় ব্যবসায়ের অবস্থান নির্বাচনের সাথে সম্পর্কিত। যে স্থানে পরিচালনা ব্যয় কম সেখানেই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললে অতি সহজে সফলতা লাভ করা যায় এবং অধিক সংখ্যক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যায়। তাই ব্যবস্থাপনা ব্যয় হ্রাস করার জন্যও ব্যবসায়ের সঠিক অবস্থান নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

১১। লক্ষ্যার্জনের সুযোগ : ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সকল সময় সঠিক অবস্থান এর লক্ষ্যার্জনের পথকে সুগম করে সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয়।

১২। ভবিষ্যৎ উন্নয়ন : যথাস্থানে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললে কখনো কখনো ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন নিশ্চিত হয় এবং সুনাশ বৃদ্ধি পায়।

সুতরাং বলা যায়, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বৃহৎ, ছোট বা মাঝারি যে আকৃতিরই হোক না কেন তা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য সর্বপ্রথমেই তার অবস্থান নির্ধারণ করতে হবে, যা ঐ প্রতিষ্ঠানের সফলতা লাভের জন্য একান্ত অপরিহার্য।

২। ব্যবসায় অবস্থানের উপর প্রভাববিস্তারকারী উপাদানসমূহ আলোচনা কর।

উত্তর: যে কোনো প্রতিষ্ঠানের ধরন বা প্রকৃতির উপর নির্ভর করে তার অবস্থান নির্বাচন করা হয়। অবস্থান নির্ধারণ এমনভাবে করা প্রয়োজন যেন ব্যবসায়ের সাফল্য অর্জন করা যায়। যে সব ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কাঁচামালের উপর নির্ভর করে, তাদের সেইসব জায়গা বেছে নিতে হয় যেখানে ঐ কাঁচামাল সহজলভ্য বা সহজপ্রাপ্য। বাংলাদেশে শ্রমিক সন্তায় পাওয়া যায় বলে বস্ত্র ও অন্যান্য শ্রমিক নির্ভর শিল্প এদেশের ক্রমেই বেড়ে উঠছে। ব্যবসায়ের অবস্থানের উপর প্রভাব বিস্তারকারী বিষয়সমূহ এ পাঠে আলোচিত হল-

১. শিল্প বা ব্যবসায়ের প্রকৃতি: অবস্থান নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ের প্রকৃতি সর্বাঙ্গে বিবেচ্য। একেক ধরনের ব্যবসায় একেক প্রকৃতির অবস্থানের জন্য উপযুক্ত বিধায় তাদের অবস্থান ভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন- ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠান একধরনের স্থানে, মাঝারী ও হালকা শিল্প প্রতিষ্ঠান অন্য স্থানে, তেমনি পণ্য উৎপাদনশীল ব্যবসায় এক স্থানে আর সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ভিন্ন স্থানে অবস্থিত হয়ে থাকে।

২. প্রয়োজনীয় সম্পদসমূহের উপস্থিতি: একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে ও কর্মোপযুক্ত হয়ে উঠতে হলে কাঁচামাল, যোগাযোগ ব্যবস্থা, শ্রমিকের সহজলভ্যতা ও অন্যান্য অবকাঠামোগত সুবিধার উপস্থিতি অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়। জলবায়ু অনুকূল যেমন দরকার তেমনি বর্জ্য নিষ্কাশন, পানি, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী সরবরাহ থাকাও প্রয়োজনীয়। সুতরাং ঐ সবগুলো উপাদান গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তারকারী।

৩. বাজার নৈকট্য: ব্যবসায় বাজার কেন্দ্রিক, তাই বিরাজমান ও সম্ভাব্য বাজার আছে এমন উপাদান সমৃদ্ধ জায়গা বিশেষভাবে বিবেচ্য। বাজার অথবা পর্যাপ্ত ক্রেতার সমাগম আছে এমন বিপণিবিতানের কাছাকাছি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হওয়া জরুরী।

৪. অর্থনৈতিক উপাদান: অর্থসংস্থানকারী ও বীমা সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে বর্তমানে ব্যবসায় পরিবেশ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এদের উপস্থিতি ব্যবসায়ের জন্য সুবিধাজনকও বটে।

৫. গুদামজাতকরণের সুবিধা: পণ্যের সুষ্ঠু সংরক্ষণের জন্য গুদামজাতকরণ প্রায়শ প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায়। এমতাবস্থায় যেকোন কাঁচামাল, উৎপাদিত পণ্য, উৎপাদন সহায়ক সম্পদ, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সংরক্ষণের জন্য গুদামজাতকরণ সুবিধা প্রতিষ্ঠানের অবস্থানের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

৬. ভূমির সুপ্রাপ্যতা: ব্যবসায় স্থাপন, প্রসার ও প্রয়োজনীয় কর্মক্ষেত্রে স্থাপনে ভূমির সুপ্রাপ্যতা ব্যাপক ভূমিকা পালন করে।

৭. সম্প্রসারণ সুবিধা: দক্ষতার সাথে ব্যবসায় কার্য পরিচালিত হলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই মুনাফা অর্জন করা যায় এবং সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণও জরুরী হয়ে যায়। কিন্তু প্রয়োজনীয় উপাদানের অভাবে সম্প্রসারণ ঝুঁকির সম্মুখীন হয়। এক্ষেত্রে পর্যাপ্ত জমি, দক্ষ জনবল ও সুলভে কাঁচামাল পাওয়া যাবে এমন জায়গায় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা জরুরী।

৮. সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা: প্রায়শ সরকার বিভিন্ন ব্যবসায়কে সহযোগিতা প্রদান করে থাকে। যেমন- বাংলাদেশে রপ্তানিমুখী শিল্প ক্ষেত্রে সরকারি ভাবে বিশেষ বিশেষ স্থানে নির্দিষ্ট ধরনের ব্যবসায়ের গোড়পত্তনের জন্য আইন শিথিল করা থেকে শুরু করে, কর মওকুফ, ঋণের সুদ মওকুফ ইত্যাদি পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকে। তাই সরকারের সম্ভাব্য নীতি ও বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনা করাও প্রয়োজন।

৯. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা: ব্যবসায় অবস্থান নির্বাচনে দেশের রাজনৈতিক অবস্থাও প্রভাব বিস্তার করে। তাই বিষয়টি বিবেচনা করে অবস্থান নির্বাচন করা প্রয়োজন।

১০. জ্বালানী ও শক্তি সম্পদের সহজলভ্যতা: উৎপাদনমুখী ব্যবসায় পরিচালনার জন্য বিভিন্ন ধরনের জ্বালানী ও শক্তি, যেমন- গ্যাস, কয়লা ও বিদ্যুৎ প্রয়োজন। স্থাপনা নির্মাণের পূর্বেই এসবের সহজলভ্যতা বিবেচনা করা প্রয়োজন।

১১. নিরাপত্তা: বিভিন্ন রকমের ঝুঁকি মোকাবেলার সকল রকম প্রস্তুতি থাকা বর্তমান সময়ে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্য অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা, দ্রুত নির্গমন পথ, চিকিৎসা সেবা, বিমা, ক্যামেরাসহ অন্যান্য বিষয়াবলী ইদানিং ব্যবহৃত হচ্ছে। এর সাহায্যে কর্মীদের উপর নজরদারিও সহজ হয়। নিরাপত্তার জন্য নিকটবর্তী দূরত্বে হাসপাতাল ও পুলিশ থানা বা ফাঁড়ি থাকলে তা প্রতিষ্ঠানের জন্য সুবিধাজনক হবে।

পরিশেষে বলা যায় যে, দক্ষ জনবল, বাজারের সান্নিধ্য, সরবরাহকারীর অবস্থান, আর্থিক সহায়তা-দানকারী প্রতিষ্ঠানের অবস্থান, সরকারের নিয়মনীতি, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, সমাজাতীয় শিল্প বা প্রতিষ্ঠানের অবস্থা, রকমারী উপযোগের উপস্থিতি ইত্যাদি ব্যবসায়ের অবস্থান নির্ধারণে প্রভাব বিস্তার করে থাকে বলে এই বিষয়গুলোকে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করতে হয়।

৩। ব্যবসায় অবস্থানের অসুবিধা/সমস্যা বর্ণনা কর।

উত্তর: সঠিক স্থানে ব্যবসায়ের অবস্থান নির্ধারণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর বিষয়। কারণ সঠিক স্থানে ব্যবসায় স্থাপিত হলে সকল দিক বিবেচনায় ব্যবসায় পরিচালনা করা সহজ হয়, সেই সাথে সাথে প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনও ত্বরান্বিত হয়। তবে যে বিষয়গুলো বিবেচনা করে ব্যবসায়ের উত্তম অবস্থান নির্বাচন করা হয় তা সকল সময় একত্রে একই স্থানে পাওয়া যায় না। আর এগুলোই ব্যবসায় অবস্থানের সমস্যা বলে বিবেচিত হয়। ব্যবসায় অবস্থানের এ সকল সমস্যা নিম্নে আলোচনা করা হলো-

১। অনুন্নত পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থা : ব্যবসায় অবস্থান নির্বাচনে সর্বপ্রথম যে বিষয়টি বিবেচনা করা হয়, তা হলো উন্নত পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থা। এ কারণে ব্যবসায়ের সহায়ক নানান ধরনের উপাদান বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র অনুন্নত পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থার কারণে বিশেষ কোনো অঞ্চলে শিল্পকারখানা গড়ে উঠে না। যেমন- পাহাড়ি অঞ্চল।

২। অপর্যাপ্ত কাঁচামাল: পর্যাপ্ত পরিমাণে কাঁচামাল না থাকলে সে অঞ্চলে সংশ্লিষ্ট-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে না। তাই অপর্যাপ্ত কাঁচামাল ব্যবসায় অবস্থানের একটি অন্যতম সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হয়। কাঁচামালের অভাবেই ঢাকা ও তার আশেপাশে কৃষিভিত্তিক শিল্পকারখানা তেমন গড়ে উঠে নি। এমনটি হওয়ার অন্যতম কারণ হলো- অপর্যাপ্ত কাঁচামাল, যা শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠার একটি অন্যতম সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হয়।

৩। দক্ষ শ্রমিক প্রাপ্তির সমস্যা অথবা দক্ষ শ্রমিকের অভাব : ব্যবসায় স্থাপনের ক্ষেত্রে শ্রমিকের পর্যাপ্ততাকেও বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়। তাই যে স্থানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শ্রমিক-কর্মী পাওয়া যায় না সে স্থানকে ব্যবসায়ের উত্তম অবস্থান বলে বিবেচনা করা হয় না। শ্রম শক্তির অভাবেই উন্নত বিশ্বের উদ্যোক্তারা নিজ দেশে। ব্যবসায় স্থাপনের পরিবর্তে শ্রমশক্তি বহুল জনসংখ্যা সমৃদ্ধ দেশগুলোতে ব্যবসায় স্থাপনে অধিক আগ্রহ দেখায়।

৪। বাজারের নৈকট্যহীনতা: বাজারের সান্নিধ্য ব্যবসায় অবস্থানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই ব্যবসায়ের অবস্থান যদি বাজার হতে খুব দূরে হয়, তাহলে তা ব্যবসায় অবস্থানের সমস্যা বলে বিবেচিত হয়। কারণ এক্ষেত্রে উৎপাদিত পণ্য বাজারে আনা-নেওয়া করার জন্য অধিক পরিমাণে অর্থ ও সময় ব্যয় করতে হয়, যা পণ্যের মোট ব্যয়কে বৃদ্ধি করে।

৫। সম্প্রসারণে বাধা: প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়টির ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের সুযোগ থাকবে কি না সে বিষয়টি বিবেচনা করে ব্যবসায়ের উত্তম অবস্থান নির্বাচন করা হয়। যদি ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের সুযোগ না থাকে তাহলে সেটি অবস্থান নির্বাচনের সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হয়। এ সমস্যার কারণে বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো শহর থেকে একটু দূরে স্থাপন করা হয়।

৬। প্রতিকূল পরিবেশ : ব্যবসায় অবস্থানের উপর প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করে এমন পরিবেশ ব্যবসায় অবস্থানের সমস্যা বলে বিবেচিত হয়। যেমন- উপকূলীয় অঞ্চলে ঘন ঘন ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বৈরি আবহাওয়া ইত্যাদি কারণে বড় বড় শিল্পকারখানা গড়ে তোলা সম্ভব হয় না। আবার একই কারণে মরু অঞ্চলেও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে না।

৭। অপর্যাপ্ত শক্তি সম্পদ: যে-কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত হলো পর্যাপ্ত শক্তি সম্পদের উপস্থিতি। তাই যে স্থানে পর্যাপ্ত পরিমাণে শক্তি সম্পদ পাওয়া যায় না সে অঞ্চলে বড় বড় শিল্পকারখানা গড়ে উঠে না। মূলত এ কারণেই বাংলাদেশে খুলনা, রাজশাহী ও রংপুর বিভাগে তুলনামূলকভাবে খুবই স্বল্প পরিমাণে শিল্পকারখানা গড়ে উঠেছে।

৮। শ্রমিক অসন্তোষ: দেশের কিছু কিছু অঞ্চল থাকে যেখানে সকল সুযোগ-সুবিধা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র শ্রমিক অসন্তোষের কারণে সে সকল অঞ্চলে ব্যবসায় স্থাপন করা সুবিধাজনক নাও হতে পারে। যেমন- বর্তমান প্রেক্ষাপটে সাভার ও গাজীপুর এলাকায় অবস্থিত গার্মেন্টস কারখানাগুলোতে প্রায়ই শ্রমিক অসন্তোষ লক্ষ করা যায়।

৯। সরকারি বিধিনিষেধ: ব্যবসায় স্থাপনবিশেষ করে শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে কিছু কিছু অঞ্চলের উপর সরকারের নিষেধাজ্ঞা থাকে। কোনো অঞ্চলের উপর সরকারের এরূপ নিষেধাজ্ঞা থাকলে সকল সুবিধা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও উক্ত অঞ্চলে ব্যবসায় বা শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করা যায় না। যেমন- বড় বড় শহরের অভ্যন্তরে শিল্পপ্রতিষ্ঠার উপর নিষেধাজ্ঞা।

১০। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা: কোনো বিশেষ অঞ্চলে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সম্ভব হয় না। তাই এটিও ব্যবসায় অবস্থানের একটি অন্যতম বাধা হিসেবে গণ্য হয়। যেমন- বাংলাদেশে পার্বত্য অঞ্চলে এ সমস্যাটি বিদ্যমান। তবে বর্তমান সরকার এটি নিরসনে সর্বাঙ্গিক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পরিশেষে বলা যায়, ব্যবসায় অবস্থান নির্ধারণের ক্ষেত্রে উপরিউক্ত বিষয়গুলো যদি ব্যবসায়ের অনুকূলে থাকে তাহলে তা ব্যবসায়িক সফলতা অর্জনে সুবিধা বয়ে আনে, অন্যদিকে এ বিষয়গুলো ব্যবসায়ের প্রতিকূলে থাকলে ব্যবসায়িক সফলতা অর্জন বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। তাই এগুলোকে ব্যবসায় অবস্থানের সমস্যা বলে বিবেচনা করা হয়।

অধ্যায়-০৫: বিজ্ঞাপন

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর

১। বিজ্ঞাপন বলতে কী বুঝায়?

বিজ্ঞাপন: বিজ্ঞাপন হচ্ছে এমন একটি কৌশল, যার সাহায্যে উৎপাদিত পণ্য সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করে তাদেরকে উক্ত পণ্য ক্রয়ে প্ররোচিত করা হয়। অর্থাৎ পণ্যের প্রতি জনগণকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিবিশেষ নৈর্ব্যক্তিক উপায়ে পণ্যের গুণাগুণ, উপযোগিতা, কার্যকারিতা, ব্যবহারবিধি বা অন্যান্য বৈশিষ্ট্য জনসাধারণের সামনে বিভিন্ন মাধ্যমের সাহায্যে তুলে ধরলে তাকে বিজ্ঞাপন বলা হয়।।

আমেরিকার মার্কেটিং এসোসিয়েশনের মতে, “নির্দিষ্ট উদ্যোক্তা কর্তৃক পণ্য, সেবা বা ভাবের প্রসারের নিমিত্তে যে কোন প্রকার অর্থপ্রদত্ত নৈর্ব্যক্তিক উপস্থাপনকে বিজ্ঞাপন বলে।”

বিজ্ঞাপনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ডেভিড কর্নস্টাইল বলেন, “বিজ্ঞাপন বিভিন্ন পণ্যের ধারণার উৎস এবং সংযোগ যা ব্যবহারকারীকে পণ্যটি ব্যবহার করতে উদ্বীপিত করে।”

জে ভল্টার টমসন-এর মতে, “বিজ্ঞাপন এমন এক বার্তা যা এক বা একাধিক ব্যক্তিকে জাগানোর জন্য বা প্রভাবিত করার জন্য মূল্য দিয়ে প্রচার করা হয়।”

সুতরাং, উৎপাদিত পণ্য বা সেবার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য পণ্যের গুণাগুণ, উপযোগিতা, কার্যকারিতা, ব্যবহারবিধি বা অন্যান্য বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি জনগণের উদ্দেশ্যে কোন গণমাধ্যমে প্রচার করা হলে তাকে বিজ্ঞাপন বলা হয়।

২। কর্পোরেট বিজ্ঞাপন কাকে বলে?

উত্তর: কর্পোরেট বিজ্ঞাপন হচ্ছে- যখন কোনো প্রতিষ্ঠান বিলবোর্ড, টিভি, রেডিওতে প্রচার, ব্যক্তিক বিজ্ঞাপন অথবা যে-কোনো উপায়ে ভোক্তাদের তার পণ্য ক্রয়ে উৎসাহিত করে। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানকেই খুঁজে বের করতে হয় ক্রেতাকে কোনো উপায়ে প্ররোচিত বা প্রলুব্ধ করা যায়। এরূপ বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে একটি প্রতিষ্ঠান তার প্রতিযোগীদের পণ্য থেকে নিজ উৎপাদিত পণ্যের গুণাগুণ ও ব্যবহারের সুফল তুলে ধরতে পারে। যা স্বাভাবিকভাবেই পণ্যের বিজ্ঞাপনদাতা প্রতিষ্ঠানকে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিযোগিতায় এগিয়ে রাখে। প্রতিষ্ঠানের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে এবং পণ্যের গুণগত মান প্রচারের মাধ্যমে ক্রেতাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতেও প্রতিষ্ঠিত কোম্পানিগুলো এরূপ বিজ্ঞাপন প্রচার করে থাকে।

৩। প্রচার কী?

উত্তর : বিজ্ঞাপন, ব্যক্তিক বিক্রয় ও বিক্রয় প্রসারের ন্যায় প্রচারও বিপণন প্রসারের অন্যতম হাতিয়ার। উৎপাদক বা উদ্যোক্তা কর্তৃক অর্থ প্রদান ব্যতীত গণমাধ্যমসমূহে পণ্য বা সেবা সম্পর্কে মতামত প্রকাশ অথবা অনুকূল উপস্থাপনার দ্বারা পরোক্ষভাবে পণ্য বা সেবার চাহিদা বৃদ্ধির প্রয়াসকে প্রচার বলে। প্রচারের একটি বড় সুবিধা হলো এতে বিজ্ঞাপনের ন্যায় অর্থ ব্যয় হয় না। বরং প্রতিষ্ঠান বা পণ্যসংক্রান্ত বিভিন্ন খবরাখবর যাতে সংবাদ আকারে পত্রিকা, রেডিও বা টেলিভিশনে আসে তজ্জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া হয়। কোনো প্রতিষ্ঠানের শাখা উদ্বোধন, পুরস্কার বিতরণী, বার্ষিক সাধারণ সভা ইত্যাদি সংবাদ ছবিসহ উপরিউক্ত মাধ্যমে আনা যেতে পারে; যা প্রতিষ্ঠানের সুনাম বৃদ্ধিতে

রচনামূলক প্রশ্ন উত্তর

১। বিজ্ঞাপনের বৈশিষ্ট্য/উদ্দেশ্যবলি আলোচনা কর।

উত্তর: আন্তর্জাতিক বাজারের সমন্বিত কার্যক্রম এবং মুক্ত বাজার অর্থনীতির প্রভাবে বাজারজাতকরণ কার্যক্রম অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করেছে। প্রসার মিশ্রনের অংশ হিসেবে বিজ্ঞাপন বাজারজাতকারীদের সাথে প্রতিযোগিতার টিকে থাকতে সহায়্য করেছে। নিচে বিজ্ঞাপনের বৈশিষ্ট্য বা উদ্দেশ্যবলি আলোচনা করা হলো:

১। চাহিদার স্থিতিশীলতা রক্ষা: বিজ্ঞাপন পণ্যের চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তার ওঠানামা হ্রাস করে ক্রেতাদের মধ্যে পণ্যের আকাঙ্ক্ষার মাত্রা স্বাভাবিক ও স্থিতিশীল রাখে। বিভিন্ন সময়ে পণ্যের বিভিন্ন ধরনের চাহিদা বিরাজ করে। প্রয়োজনীয় মৌসুমে পণ্যের চাহিদা সবসময় অত্যধিক থাকে এবং অন্যান্য মৌসুমে এ চাহিদার মাত্রা স্বাভাবিকভাবে হ্রাস পায়।

২। পণ্যের নতুন ব্যবহার বৃদ্ধি : গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে অনেক পণ্যের নতুন ব্যবহার আবিষ্কার করা সম্ভব। পণ্যের নতুন ব্যবহার ক্রেতাদের জানানোর জন্য বিজ্ঞাপন একটি কার্যকর মাধ্যম। বিজ্ঞাপন ও প্রচারের ফলে ক্রেতারা বিদ্যমান পণ্যটির নতুন ব্যবহার সম্পর্কে জানতে পারে। ফলে ক্রেতাদের মাঝে পণ্যটির চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং সেই সাথে পণ্যটির ব্যবহারও বৃদ্ধি পায়, যেমন- ক্রেতারা Tang সাধারণত গরমের দিনে তৃষ্ণা মেটানোর জন্য পান করে। কিন্তু গরম পানিতে Tang-এ বিজ্ঞাপন প্রচারের ফলে ক্রেতারা শীতের দিনেও Tang পান করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

৩। উৎপাদন বৃদ্ধি : বিজ্ঞাপন পণ্যের ব্যাপক চাহিদা সৃষ্টি করে। ফলে বিপুল পরিমাণ ক্রেতা পণ্যটি ক্রয়ে উৎসাহিত হয়। এতে প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বিশাল বাজার ও শেয়ার গ্রহণ করা সম্ভব হয়। বিশাল বাজার শেয়ার গ্রহণ করতে প্রতিষ্ঠানকে বিপুল উৎপাদনে নিয়োজিত হতে হয়, যা প্রতিষ্ঠানকে বিশাল ক্রয় ও বিক্রয় সুবিধা প্রদান করে। তাই বলা হয়, বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠানের গণ উৎপাদনে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে।

৪। প্রতিষ্ঠানের সুনাম সৃষ্টি : সব প্রতিষ্ঠান শুধু বিক্রয় বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই বিজ্ঞাপন প্রচার করে না; পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের ভালো সুনাম ও ইমেজ তৈরিতেও বিজ্ঞাপন প্রচার করে। যেসব ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বিশ্বস্ততা খুব গুরুত্বপূর্ণ সে প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞাপন প্রচারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সুনাম তৈরিতে বেশি গুরুত্ব দেয়, যা প্রতিষ্ঠানের বিশ্বস্ততা প্রতিষ্ঠায় বিভিন্নভাবে কাজ করে থাকে। যেমন- বিভিন্ন দেশের ব্যাংক ব্যবসায়ীরা এ ধরনের বিজ্ঞাপন প্রচার করে থাকে। আমাদের দেশে উপয ইখহমমখ ব্যাংক একই উদ্দেশ্যে এ ধরনের বিজ্ঞাপন প্রচার করছে।

৫। পণ্যের বিক্রি অব্যাহত রাখা : মূলত পণ্যের বিক্রি বৃদ্ধি করাই বিজ্ঞাপনের প্রধান উদ্দেশ্য। এমন কিছু পণ্য রয়েছে যে ক্ষেত্রে ক্রেতারা অভ্যাসগত ক্রয় আচরণ প্রদর্শন করে। এক্ষেত্রে ক্রেতারা পণ্যটি সম্পর্কে খুব বেশি তথ্য সংগ্রহ করে না। শুধু বাজারে বিদ্যমান পণ্যগুলো হতে ব্যাপকভাবে প্রচারিত পণ্যটিই ক্রয় করে। যেসব প্রতিষ্ঠান সর্বাধিক বিজ্ঞাপন প্রচার করে সেসব প্রতিষ্ঠানের বিক্রয়ও সর্বাধিক। যেমন- লবণ, আগে ক্রেতারা লবণ ক্রয়ে মোল্লাসল্ট লবণকে প্রাধান্য দিত, কিন্তু কিছুদিন আগে গ্লোব লবণ প্রচুর বিজ্ঞাপন প্রচার করে বিশাল বাজার দখল করে নেয়।

৬। নতুন বাজার সৃষ্টি : বিজ্ঞাপনের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে পণ্যের নতুন বাজার সৃষ্টি। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বা আঞ্চলিক পরিমণ্ডলে বিজ্ঞাপন পণ্য সম্পর্কে নতুন ক্রেতাদের ব্যাপক তথ্য সরবরাহ করে। ফলে পণ্যের বাজার সৃষ্টি সম্ভব হয়। যেমন- বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলো একটি দেশে পণ্য বিক্রির ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে এ উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপন কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে।

৭। চাহিদা সৃষ্টি ও বৃদ্ধি : বিজ্ঞাপন পণ্যের সেবা প্রাপ্তি, নতুন ব্যবহার জ্ঞাপন, সেবার মান সম্পর্কে ক্রেতাদের পর্যাণ্ড তথ্য প্রদান করে। ফলে ক্রেতার কাছে উক্ত পণ্যের চাহিদা সৃষ্টি, চাহিদা বৃদ্ধি এবং চাহিদা অব্যাহত রাখা সম্ভব হয়। এ ছাড়া, একটি নতুন কোম্পানির পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি ও বিক্রয় বৃদ্ধিতে বিজ্ঞাপন বিভিন্নভাবে প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করে থাকে।

৮। সমজাতীয় পণ্য মোকাবেলা : মুক্তবাজার অর্থনীতিতে একই সাথে একটি পণ্যের অনেক বিক্রেতা বিরাজ করে। বিজ্ঞাপন এরূপ পরিস্থিতিতে সমজাতীয় পণ্য উৎপাদনকারীদের মোকাবেলায় কার্যকরভাবে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ফলে, বাজারে প্রতিষ্ঠানের অবস্থান সুসংহত ও সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করা সম্ভব হয়। কারণ, বিজ্ঞাপন সমজাতীয় উৎপাদনকারীদের সাথে বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানের পণ্যের তুলনামূলক ও শ্রেষ্ঠত্বমূলক তথ্য প্রচার করে। এভাবে প্রতিষ্ঠানের সব প্রকার প্রতিযোগীকে মোকাবেলা সম্ভব হয়।

৯। ক্রয়জনিত সুযোগ-সুবিধা প্রচার ও বিক্রয় বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিক্রয় প্রসার কার্যক্রম হিসেবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের ক্রয়জনিত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে থাকে, যেমন- মূল্য হ্রাস, লটারি, উপহার ইত্যাদি। ক্রেতাদের কাছে পণ্য সম্পর্কিত এসব ক্রয়জনিত সুযোগ-সুবিধা প্রচার করে বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় প্রসার কার্যক্রমের উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়তা করে থাকে।

১০। ক্রেতাদের প্ররোচিত করা ও ক্রেতারা পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে শুধু গুণাগুণই বিবেচনা করে না, সেই সাথে পণ্যের বাড়তি কিছু মানসিক তৃপ্তি আশা করে। বিজ্ঞাপন পণ্যের উপাদানগত গুণাবলির সাথে সাথে পণ্যের মানসিক পরিতৃপ্তিতেও কাজ করে থাকে। প্রসাধন সামগ্রী ক্রয়ে ক্রেতারা পণ্যের এরূপ মানসিক পরিতৃপ্তি বেশি আশা করে। “Lux-এর ছোঁয়ায় আমি স্টার হয়ে যাই” এরূপ একটি বিজ্ঞাপন। অভিনেত্রী মৌসুমীর Tibet স্নো-এর

বিজ্ঞাপন দেখে ক্রেতারা যখন এ স্লো ব্যবহার করে তখন তারা নিজেদের মাঝে মৌসুমীর সৌন্দর্যের পরিতৃপ্তি লাভ করে। তবে এসব বিজ্ঞাপন সাধারণত কম শিক্ষিত ক্রেতাদের ক্ষেত্রে বেশি কার্যকর।

১১। সচেতনতা বৃদ্ধি : বিজ্ঞাপন শুধু বেসরকারি মুনাফাভোগী প্রতিষ্ঠানই প্রচার করে না, বরং সরকার ও সরকারি বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বিভিন্ন সময় দেশের জনগণের সমাজ, পরিবেশ ও দেশ সম্পর্কে সচেতন করার জন্য বিভিন্ন ধরনের বিজ্ঞাপন প্রচার করে। যেমন- কোরবানি ঈদের আগে গরুর বর্জ্য পদার্থ সুষ্ঠুভাবে নিষ্কাশন, বন্যার পূর্বাভাস ও পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে সরকারি বিভিন্ন বিজ্ঞাপন প্রচার করে থাকে। এ ছাড়া সামাজিক বাজারজাতকরণে উদ্বুদ্ধ হয়ে বর্তমানে বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও সমাজ সচেতনতামূলক বিভিন্ন বিজ্ঞাপন প্রচার করছে।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য ও বিষয়বলি বিশদ জানা যায়।

২। বিজ্ঞাপন মাধ্যমের প্রকারভেদ আলোচনা কর।

নিচে বিজ্ঞাপন মাধ্যমের প্রকারভেদ আলোচনা করা হলোঃ বিজ্ঞাপন মাধ্যম বলতে এমন কোনো উপায় বা অবলম্বনকে বুঝায় যার মাধ্যমে বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুকে জনসমক্ষে তুলে ধরা হয়। প্রত্যাশিত ক্রেতাসাধারণের নিকট বিক্রয় সংক্রান্ত সংবাদ পৌঁছানোর প্রক্রিয়াকেই বিজ্ঞাপন মাধ্যম বলা হয়। নিম্নে বিজ্ঞাপনে বহুল ব্যবহৃত মাধ্যমসমূহ আলোচনা করা হলো-

১. সংবাদপত্র: সকল ধরনের পণ্য ও সেবা প্রচারে সংবাদপত্র একটি স্বল্প ব্যয়সাপেক্ষ অথচ দ্রুত দূর-দূরান্তের জনগণের নিকট বার্তা পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে সক্ষম একটি সহজ মাধ্যম। এরূপ মাধ্যমের সুবিধা হলো কম খরচে, সহজেই এর বিষয়বস্তু পরিবর্তন করা যায় এবং প্রয়োজনানুযায়ী একবার বা একাধিকবার প্রচার করা যায়। তবে এর অসুবিধা হলো, শুধুমাত্র শিক্ষিত মানুষ এবং যাদের কাছে পত্রিকা পৌঁছে তারাই এই ধরনের বার্তা সম্পর্কে জানতে পারে। এ ছাড়া এই মাধ্যমের আবেদন অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী।

২. সাময়িকী: সাপ্তাহিক, মাসিক, পাক্ষিক, বাৎসরিক সাময়িকীতে উন্নতমানের কাগজে মুদ্রণ ও রংবেরঙের চিত্রের মাধ্যমে বিজ্ঞাপনকে আকর্ষণীয় করে তোলা যায়। এর স্থায়িত্ব সংবাদপত্র অপেক্ষা বেশি। এই ধরনের সাময়িকী বেশি সময় ধরে পাঠক পাঠ করে। বিশেষ ধরনের পণ্য বিশেষ শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর সামনে তুলে ধরার ক্ষেত্রে এটিও সংবাদপত্রের ন্যায় একটি স্বল্প ব্যয়সাপেক্ষ মাধ্যম।

৩. প্রচারপত্র: পণ্যসামগ্রীর বৈশিষ্ট্য, গুণাগুণ, উপযোগিতা, বিক্রয় প্রসার ইত্যাদি সম্বলিত প্রচারপত্র ছাপিয়ে জনবহুল স্থানে লোক মারফত বিলি করা বা ডাকযোগে মানুষের নিকট প্রেরণ এ ধরনের বিজ্ঞাপনের বৈশিষ্ট্য। এর সুবিধা হলো, এরূপ মুদ্রিত প্রচারপত্র পড়ে জনসাধারণ সহজেই পণ্য সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে পারে। তবে এর অসুবিধা হলো অনেকেই এই প্রচারপত্র না পড়ে ফেলে দেয় এবং বিলি করাও অনেক কষ্টকর। আবার বিজ্ঞাপিত পণ্যের গুণাগুণ সম্পর্কে প্রায় লোকই সন্দেহ পোষণ করে।

৪. প্রাচীরপত্র: বড় বড় হরফে পোস্টার লিখে বা ছাপিয়ে লোক চলাচলের স্থানে, বাসস্ট্যাণ্ডে রাস্তার মোড়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। ফলে সহজেই বিজ্ঞাপন বার্তা জনগণের নজরে আসে।

৫. বিজ্ঞাপনী ফলক: রাস্তার মোড়ে, গুরুত্বপূর্ণ স্থানে কাঠ বা হার্ডবোর্ডের বিজ্ঞাপনী ফলক তৈরি করে তার ওপর পণ্য বা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দেয়াটা প্রাচীনকাল হতেই একটা জনপ্রিয় বিজ্ঞাপনী মাধ্যম। এটি অনেকটা স্থায়ী প্রকৃতির, যে কারণে অনেকদিন তা বিজ্ঞাপন সুবিধা প্রদান করে। বড় বড় বিল্ডিংয়ের গায়ে বা ছাদে ও স্টেডিয়ামগুলোতে এরূপ ফলক তৈরি করে বিজ্ঞাপন দেয়া হয়।

৬. রেডিও: বিজ্ঞাপনের জন্য বর্তমানে উন্নত ও অনুন্নত প্রায় সকল দেশেই রেডিও একটি জনপ্রিয় মাধ্যম যা ব্যবহার করে পণ্য সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বার্তা অত্যন্ত চমৎকারভাবে তুলে ধরা হয়। এর মাধ্যমে শহর ও গ্রামের সকল অঞ্চলের শিক্ষিত-অশিক্ষিত বিপুল জনগোষ্ঠীর নিকট পণ্য বার্তা পৌঁছে দেয়া যায়।

৭. টেলিভিশন: সমগ্র বিশ্বজুড়ে দ্রুত পণ্য ও সেবা প্রচারে টেলিভিশন একটি অত্যন্ত সুপরিচিত ও কার্যকরী মাধ্যম। এর মাধ্যমে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর সামনে পণ্য বা সেবার আবেদন সহজে ও চমৎকারভাবে তুলে ধরা যায়। এ মাধ্যমের বড় অসুবিধা হলো এটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল।

৮. সরাসরি ডাক মারফত বিজ্ঞাপন: চিঠিপত্র, কার্ড, পঞ্জিকা, পুস্তিকা, মূল্য তালিকা, প্রচার পত্র ইত্যাদি এই ধরনের বিজ্ঞাপনের অন্তর্ভুক্ত। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি সাধারণত শপিং পণ্যের উৎপাদক ও ডিলারদের নিকট পণ্যের বিক্রয় সংবাদ প্রেরণের জন্য এ পদ্ধতির ব্যবহার করা হয়। সাধারণভাবে জনসাধারণের নিকট তথ্য প্রেরণের জন্য ও সম্ভাব্য গ্রাহকদের ঠিকানা জানা না থাকলে এ পদ্ধতি কার্যকর হয়না। তাছাড়া, এতে মুদ্রণ খরচ ও ডাক খরচ মিলিয়ে বিজ্ঞাপন ব্যয় অনেক বেড়ে যায়।

৯. উন্মুক্ত স্থানে বিজ্ঞাপন: শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে যেখানে সর্বদা বহু লোকের সমাবেশ হয় অথবা প্রাত্যহিক কাজে যাতায়াতের পথে খোলা জায়গায় বৈদ্যুতিক সাইন, পোস্টার বা রঞ্জিত সাইনবোর্ডে পণ্যসামগ্রীর বিজ্ঞাপন দেয়া হয়। লোকজন পথ চলার সময় সেগুলো দেখে, পড়ে এবং আকৃষ্ট হয়। ফলে এ ধরনের বিজ্ঞাপন তাদের মনে স্থায়ী দাগ কাটতে সক্ষম হয় এবং তারা বিজ্ঞাপিত পণ্য ক্রয় করতে আগ্রহী হয়।

১০. ডিজিটাল বিজ্ঞাপন : নেটওয়ার্ক বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে পণ্য বা সেবা সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে ও ক্রয়ে উৎসাহ প্রদান করে। বর্তমান সময়ে ক্রেতা ও ভোক্তা জগতে বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস ও ইন্টারনেট ব্যবহার জনপ্রিয় হবার কারণে ডিজিটাল বিজ্ঞাপন বেশ জনপ্রিয়। কিন্তু যারা ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস বা ইন্টারনেট ব্যবহার করে না বা ব্যবহারের সুযোগ নেই, তারা বিপণনকারীর বিজ্ঞাপন সম্পর্কে অবগত থাকে না।

১১. পরিবহন বিজ্ঞাপন: বিভিন্ন প্রকার গাড়ি বিশেষ করে ট্রাক বা বাস, ট্যাক্সি, রিকশার গায়ে পণ্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে পণ্য বিজ্ঞাপিত করা হয়।

১২. নমুনা: প্রদর্শনীতে শিল্পজাত, কৃষিজাত ও অন্যান্য দ্রব্যের স্টল খুলে কার্যকরীভাবে জনসাধারণের নিকট পণ্যের সংবাদ পৌঁছিয়ে দেয়া যায়। অসংখ্য লোক প্রদর্শনীতে এসে ঘুরে ফিরে বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করে এবং বিভিন্ন পণ্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সেবাপণ্য এবং গুণ্যাদির ক্ষেত্রে নমুনা বিজ্ঞাপনের ব্যাপক প্রচলন দেখা যায়।

উপরোক্তভাবে আমরা বিজ্ঞাপন মাধ্যমের প্রকারভেদ আলোচনা করতে পারি।

৩। বিজ্ঞাপনের মাধ্যম নির্বাচনের বিবেচ্য বিষয়সমূহ আলোচনা কর।

উত্তর: একজন ব্যবসায়ীর পক্ষে সবগুলো মাধ্যম একই সাথে ব্যবহার করা যেমন অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সম্ভব নয়, তেমনি একটি পণ্যের বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য সব মাধ্যমের ব্যবহার কার্যকর নাও হতে পারে। আবার শুধুমাত্র একটি মাধ্যমও সমস্ত সম্ভাব্য গ্রাহকের আকৃষ্ট করার জন্য যথেষ্ট নয়। গ্রাহকদের অভ্যাস-রুচিতে এত বেশি তারতম্য পরিলক্ষিত হয় যা বিজ্ঞাপন অভিযানে একাধিক মাধ্যম ব্যবহার প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। কোন বিজ্ঞাপনের জন্য কোন মাধ্যমটি সর্বোত্তম হবে তা বলা অত্যন্ত কঠিন। কারণ বিজ্ঞাপনের মাধ্যম নির্বাচনে পারিপার্শ্বিকতার বিষয়টি ছাড়াও অনেকগুলো বিষয় প্রভাব বিস্তার করে। সেগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

১. পণ্যের প্রকৃতি: কোন প্রকারের মাধ্যম পণ্যের প্রচারের জন্য শ্রেয় হবে তা পণ্যের প্রকৃতির উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। তাই দেখা যায়, ভোগ্যপণ্য সাধারণত সংবাদপত্র, সাময়িকী, রেডিও, টেলিভিশনে এবং উৎপাদনশীল পণ্য বিশেষ সাময়িকী, টেকনিক্যাল জার্নাল, এবং প্রত্যক্ষ ডাক মারফত বিজ্ঞাপিত হয়। সব রকমের পণ্যের জন্য সব মাধ্যম উপযোগীও নয়। যেমন, সাবান বা লবণের বিজ্ঞাপন টেলিভিশন বা সংবাদপত্রে দেওয়া হয়। আবার তৈরি পোশাকের কাঁচামালের বিজ্ঞাপন ব্যবসায় সম্পর্কিত সাময়িকী বা ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়।

২. বাজারের সম্ভাব্যতা: সম্ভাব্য বাজারের বৈশিষ্ট্য ও বিজ্ঞাপনের মাধ্যম নির্বাচন প্রভাবিত করে। মাধ্যম নির্বাচনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো পণ্যের সম্ভাব্য ব্যবহারকারীদের সঠিকভাবে চিহ্নিত করা। পণ্যের বাজার নির্দিষ্ট স্থানে বা নির্দিষ্ট শ্রেণীর ভোক্তাদের মধ্যে সীমিত হলে মাধ্যম নির্বাচন ততটা জটিল মনে হয় না। পক্ষান্তরে বাজারের পরিধি বিস্তৃত হলে, বিভিন্ন শ্রেণীর ভোক্তার মধ্যে পণ্যের চাহিদা থাকার সম্ভাবনা থাকলে বিজ্ঞাপনের মাধ্যম নির্বাচনে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়।

৩. বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য: বিপণনকারীর জন্য পণ্য প্রচারের ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনের মাধ্যম নির্বাচনে বিজ্ঞাপনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি তা বিবেচনায় রাখতে হয়। যেমন ধরুন, বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য যদি হয় ভোক্তাদের মধ্যে তাত্ক্ষণিক বিক্রয় বৃদ্ধি, তাহলে টেলিভিশন বা রেডিও হলো উপযুক্ত মাধ্যম। আর বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য যদি হয় ডিলারদের সহযোগিতা কামনা করা, তবে ট্রেড জার্নাল ও বিশেষ ডাক হবে কার্যকর পছন্দ। নতুন পণ্যের প্রবর্তন কিংবা পুরনো পণ্যের চাহিদা সৃষ্টির সাথেও বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য সম্পর্কযুক্ত হতে পারে। ফলে উদ্দেশ্য অনুযায়ী বিজ্ঞাপন মাধ্যমের তারতম্য ঘটতে পারে।

৪. বিক্রয়ের আবেদনের প্রকারভেদ: বিজ্ঞাপনের জন্য কোন প্রকার মাধ্যম ব্যবহার করা সঙ্গত তা নির্ধারণের জন্য বিক্রয় সংক্রান্ত তথ্য বা আবেদনের প্রকৃতি ও প্রকারভেদ বিবেচনা করা অত্যাাবশ্যিক। উদাহরণস্বরূপ, যদি এরূপ বিশ্বাস করা হয় যে, পণ্য বিজ্ঞাপনের কার্যকারিতায় মনোহর রঙিন চিত্র গুরুত্বপূর্ণ, তবে মাধ্যম হিসেবে সাময়িকী হবে প্রথম পছন্দ। কারণ সংবাদপত্রের চেয়ে সাময়িকীতে অনেক বেশি দক্ষতর ও সুন্দরতর উপায়ে বিজ্ঞাপনকে আকর্ষণীয় করে তোলা যায়।

৫. মাধ্যমের প্রচলন: যে মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রচার করার জন্য চিন্তা-ভাবনা করা হয় সে মাধ্যমটির প্রচলন কিরূপ তা বিবেচনা করে দেখতে হবে। পণ্যের বস্তুনিষ্ঠ প্যাটার্নের সাথে মাধ্যমের প্রচলন সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। স্বল্পতম অপচয়ে, অধিক সংখ্যক সম্ভাব্য ক্রেতার নিকট পণ্য-সংবাদ পৌছাতে পারে এমন মাধ্যম নির্বাচন করা প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, প্রসাধনী সামগ্রীর প্রস্তুতকারকের অতীষ্ট ভোক্তা যদি মহিলা হয়ে থাকে, তাহলে এমন পত্রিকা বা সাময়িকীতে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে যেগুলো মহিলারা পড়ে থাকে।

৬. বিজ্ঞাপন মাধ্যমসমূহের ব্যয়: বিজ্ঞাপনের বিভিন্ন মাধ্যম থেকে উপযুক্ত মাধ্যম নির্বাচনের সময় একেক মাধ্যম ব্যবহার করলে কিরূপ খরচ হতে পারে তা বিবেচনা করা অবশ্যই প্রয়োজনীয়। কারণ সব মাধ্যমের ব্যয় একরূপ নয়। কোন মাধ্যমের ব্যয় অনেক বেশি আবার কোন মাধ্যমের ব্যয় কম হতে পারে। রেডিও এবং টেলিভিশনে সেকেন্ডের ভিত্তিতে বিজ্ঞাপনের জন্য যে রেইটটি চার্জ করা হয় তা সংবাদপত্রে প্রতি কলামের আয়তনের ভিত্তিতে ধার্যকৃত রেইট থেকে অনেক বেশি। তাই যেসব বিজ্ঞাপকের পক্ষে ব্যয়বহুল মাধ্যম ব্যবহার সম্ভব তারা সেগুলো ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু যাদের বিজ্ঞাপন খাতে সংরক্ষিত তহবিল একটি বিশেষ মাধ্যম ব্যবহারের জন্য যথেষ্ট নয় তাদের সে মাধ্যম পরিহার করা উচিত।

৭. প্রাপ্তব্য বাজেট: বিজ্ঞাপনের মাধ্যম নির্বাচনে বিজ্ঞাপনের জন্য বরাদ্দকৃত তহবিল যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। মাধ্যম পছন্দ করার সময় খেয়াল রাখতে হবে যে, বিজ্ঞাপন বাবদ যে বাজেট অনুমোদন করা হয়েছে তা বিশেষ একটি মাধ্যম ব্যবহারের জন্য যথোপযুক্ত কিনা।

৮. গ্রাহকদের শিক্ষার মান: ক্রেতার শিক্ষার মানের উপর বিজ্ঞাপনের মাধ্যম নির্বাচন বহুলাংশে নির্ভরশীল। বাংলাদেশের জনসাধারণকে আমরা শিক্ষার মান অনুযায়ী তিন শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি- নিরক্ষর, অক্ষরজ্ঞান বিশিষ্ট বা আধা-শিক্ষিত এবং উচ্চ শিক্ষিত। নিরক্ষর/অশিক্ষিত লোকদের নিকট পণ্য সংবাদ পৌছানোর জন্য লিখিত কোন মাধ্যম (সংবাদপত্র, সাময়িকী, ইস্তাহার, প্রচারপত্র ইত্যাদি) ব্যবহার সম্পূর্ণ অর্থহীন। তাদের জন্য রেডিও টেলিভিশন বা চিত্রবিশিষ্ট অর্থময় সাইনবোর্ড বিশেষ উপযোগী। তাই বিজ্ঞাপনের মাধ্যম নির্বাচনের সময় সম্ভাব্য গ্রাহকদের শিক্ষার মান বিবেচনায় রাখা উচিত।

উপরোক্তভাবে আমরা বিজ্ঞাপন মাধ্যম নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়সমূহ আলোচনা করতে পারি।

৪। বিজ্ঞাপন ও প্রচারের মধ্যে পার্থক্য লিখ।

উত্তর: নিচে বিজ্ঞাপন ও প্রচারের মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরা হলো:-

পার্থক্যের বিষয়	বিজ্ঞাপন	প্রচার
১। সংজ্ঞা	অর্থপ্রদত্ত মাধ্যমে পণ্যদ্রব্য ও সেবা- কর্মীদের সাথে জনগণ তথা ক্রেতা সাধারণকে পরিচয় করিয়ে দেয়ার প্রক্রিয়াকে বিজ্ঞাপন বলে।	ব্যবসায়িক কোনো বিষয়ে তথ্য বা সংবাদ অর্থ প্রদান ছাড়াই কোনো মাধ্যমকে ব্যবহার করে জনগণকে জ্ঞান করানোর প্রচেষ্টাকে প্রচার বলে।
২। উদ্দেশ্য	বিজ্ঞাপন সাধারণ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যেই দেয় হয়।	প্রচারের উদ্দেশ্য হলো প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বা কোনো পণ্য বা সেবা সম্পর্কে ক্রেতাসাধারণের মাঝে ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তোলা।
৩। আওতা	বিজ্ঞাপনের কার্যক্ষেত্র সীমিত।	প্রচারের আওতা ব্যাপক।
৪। মাধ্যম	বিজ্ঞাপন মূলত লিখিত বা মুদ্রিত মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।	প্রচার মুদ্রিত বা অমুদ্রিত, মৌখিক বা দৃশ্যমান যেকোন মাধ্যমে প্রকাশ করা যেতে পারে।
৫। শাখা	এটি বাণিজ্যের একটি শাখা।	এরি গণযোগাযোগের একটি শাখা।
৬। ব্যয়	বিজ্ঞাপনের ব্যয় বেশি হয়।	প্রচারের ব্যয় কম হয়।
৭। আবেদন	এর আবেদন ব্যক্তিক ও ব্যষ্টিক।	এর আবেদন সর্বত্র এক ধরনের নয়। কখনও এর আবেদন থাকে সীমিত আবার ক্ষেত্রবিশেষে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর উদ্দেশ্যেও তা প্রচারিত হয়।

৫। বিজ্ঞাপন কি অপচয়? - ব্যাখ্যা কর।

উত্তর বর্তমান যুগ প্রচারের যুগ। প্রচারের বিভিন্ন মাধ্যমের মধ্যে বিজ্ঞাপন একটি প্রধান মাধ্যম। বিজ্ঞাপন ব্যাপক উৎপাদন ও বস্তুনিষ্ঠ সহজতর করেছে। মানুষের ভোগকে করেছে বৈচিত্র্যপূর্ণ, সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্যময়। বর্তমানকালে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে সেই সাথে এর বিরুদ্ধে সমালোচনাও কম হচ্ছে না। বিজ্ঞাপন অপচয় বা অপপ্রয়োজনীয় কি না এ সম্পর্কে পরস্পর বিপরীত মতামত লক্ষ করা যায়। নিম্নে বিজ্ঞাপনের বিপক্ষে ও পক্ষে মতামত তুলে ধরা হলো-

(ক) বিপক্ষে মতামত অর্থাৎ বিজ্ঞাপন অপচয় : এ মতের বিশ্বাসীরা মনে করে বিজ্ঞাপন অপচয় বা এর প্রয়োজনীয়তা খুবই কম। নিম্নে এরূপ ধারণার পক্ষে অর্থাৎ বিজ্ঞাপনের বিপক্ষে যুক্তি তুলে ধরা হলো-

১। সামাজিক অপচয়: অনেকেই মনে করেন, বিজ্ঞাপন জীবনধারণের মানোন্নয়নের নামে অপপ্রয়োজনীয় পণ্য ক্রয়ে প্ররোচিত করে, যা সামাজিক অপচয় বৈ কিছু নয়।

২। মূল্য বৃদ্ধি: বাজার দখলের অশুভ প্রতিযোগিতায় উৎপাদনকারীগণ প্রচুর পরিমাণে বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকেন। আর এরূপ বিজ্ঞাপন খরচের কারণে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পায়, যা ক্রেতাদের ক্রয় ক্ষমতার ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে।

৩। প্রবঞ্চনামূলক কাজ : অনেক সময় বিজ্ঞাপনদাতা পণ্যের প্রকৃত গুণাগুণ গোপন করে বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকে, অথবা মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত বক্তব্য তুলে ধরে বিজ্ঞাপন দেয়। ফলে চটকদার বিজ্ঞাপনের ফাঁদে পড়ে ক্রেতাগণ প্রতারিত হন।

৪। ক্রেতার স্বাধীনতা হরণ : বিজ্ঞাপন ক্রেতাদের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ চিন্তার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে। কেননা বিজ্ঞাপনের ফলে ক্রেতা তার প্রত্যাশিত পণ্য ক্রয়ের স্বাধীনতা হারায়। এর ফলে ক্রেতাদের পণ্য ক্রয়ে পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ পরিলক্ষিত হয়।

৫। ক্ষতিকর বিজ্ঞাপন: জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতাবিরোধী বিজ্ঞাপন সম্পর্কে সবশ্রেণির ব্যক্তিবর্গেরই কমবেশি আপত্তি থাকে। এ জাতীয় বিজ্ঞাপনে বিজ্ঞাপনদাতার লাভ হলেও জনসাধারণ তথা সমাজের ক্ষতি হয়।

৬। একচেটিয়া বাজার সৃষ্টি : বৃহদায়ন প্রতিষ্ঠানসমূহ অর্থের জোরে ব্যাপক বিজ্ঞাপন দিয়ে অনেক সময় একচেটিয়া বাজার সৃষ্টি করে। এতে নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান এগুতে পারে না।

(খ) পক্ষে মতামত অর্থাৎ বিজ্ঞাপন অপচয় নয় : এ মতের বিশ্বাসীরা মনে করে বিজ্ঞাপন অপচয় নয় বরং বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায়িক জগতে এটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি বিষয়। নিম্নে বিজ্ঞাপনের পক্ষে অর্থাৎ বিজ্ঞাপন অপচয় নয় এর পক্ষে যুক্তি তুলে ধরা হলো-

১। বৃহদায়ন উৎপাদন ও ব্যয় হ্রাস: বিজ্ঞাপন পণ্য মূল্য বৃদ্ধি করে তা ঠিক নয়। কারণ বিজ্ঞাপনের ফলে পণ্যের চাহিদা ব্যাপক বৃদ্ধি পায় ও বৃহদায়ন উৎপাদন সম্ভব হয়। আর এর ফলশ্রুতিতে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায়। শুধু উৎপাদনই ব্যয়ই নয়, এতে একক প্রতি মোট ব্যয়ও কম হয়।

২। পণ্য ও সেবার সহজে পরিচিতকরণ: বর্তমান বৃহদায়ন উৎপাদনের যুগে পণ্য ও সেবাকে সহজে জনসমক্ষে তুলে ধরার ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপন ছাড়া উত্তম আর কোনো বিকল্প মাধ্যম নেই। আর উৎপাদন কার্যে এরূপ পরিচিতকরণের গুরুত্ব কখনই অস্বীকার করা যায় না।

৩। উত্তম পণ্য ও সেবার প্রচার: দু'একটি ব্যতিক্রম ক্ষেত্র ছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিজ্ঞাপন ক্রেতাদের চাহিদা ও পছন্দমামুলিক পণ্য ও সেবার প্রচার করে। তাই ব্যতিক্রম ক্ষেত্র বিবেচনায় এনে এর বৃহত্তর উপযোগিতা অস্বীকার করা শুভ বুদ্ধির পরিচায়ক নয়।

৪। ক্রেতা বা ভোক্তা সচেতনতা বৃদ্ধি: বিজ্ঞাপন ক্রেতাদের ক্রয় স্বাধীনতা হরণ করে, ঢালাওভাবে এটা মনে করা ঠিক নয়। বর্তমানকালে প্রতিযোগী প্রত্যেক ব্যবসায়ীই তাদের পণ্য ও সেবার প্রচার করে, যা ক্রেতাদের বিভিন্ন পণ্য ও সেবা সম্পর্কে ধারণা পেতে সচেতন হতে ও তার মধ্য হতে নিজ পণ্য বাছাই করতে সহায়তা করে।

৫। প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি : বর্তমানকালে পণ্যের মান ও সেবা সুবিধা নিশ্চিত না করে শুধুমাত্র বিজ্ঞাপনের জোরে একচেটিয়া বাজার সৃষ্টি সম্ভব নয়। বরং মুক্তবাজার অর্থনীতিতে বিজ্ঞাপন প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টিতেই সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

উপরিউক্ত আলোচনা হতে এটাই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, বিজ্ঞাপন বর্তমানকালে অপচয় বা অপ্রয়োজনীয় তো নয়ই বরং বাণিজ্যের একটি অতি প্রয়োজনীয় উপাদান হিসেবেই গণ্য হয়। বর্তমান বিশ্বজোড়া বাজারে প্রতিযোগী কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই বিজ্ঞাপনের সহযোগিতা ভিন্ন অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাই অসম্ভব।

অধ্যায়-০৬: ব্যক্তিক বিক্রয়

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। ব্যক্তিক বিক্রয় কাকে বলে?

উত্তর: বিপণনকারী ও ভোক্তার মধ্যে বিনিময়ের উদ্দেশ্যে যখন দ্বিমুখী যোগাযোগ স্থাপিত হয়, তখন তাকে ব্যক্তিক বিক্রয় বলা হয়। বিক্রয় সংঘটনের উদ্দেশ্যে এক বা একাধিক সম্ভাব্য ক্রেতার সঙ্গে আলাপকালে মৌখিকভাবে পণ্যের উপস্থাপনই হলো ব্যক্তিক বিক্রয়। সুতরাং ব্যক্তিক বিক্রয়ে বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানের পণ্য ও সেবা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগতভাবে সরাসরি ক্রেতার কাছে বিক্রয় আবেদন করা হয় ও ক্রয় করার জন্য আগ্রহী করে তোলা হয়। আবার নতুন পণ্য বিপণন করার সময়ও ব্যক্তিক বিক্রয়কে কাজে লাগিয়ে বিক্রয় প্রসারের প্রচেষ্টা চালানো হয়।

নিচে ব্যক্তিক বিক্রয়ের কিছু সংজ্ঞা তুলে ধরা হলো:-

Philip Kotler-এর মতে, “ব্যক্তিক বিক্রয় হলো এক ধরনের ব্যক্তিগত উপস্থাপনা, যা ফার্মের বিক্রয়কর্মীর দ্বারা বিক্রয় করা এবং ক্রেতাদের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করার উপায়।”

American Marketing Association-এর মতে, “বিক্রেতার বাণিজ্যিক গুরুত্ব বৃদ্ধি করার জন্য ব্যক্তিগত যে প্রক্রিয়ায় সম্ভাব্য ক্রেতাকে পণ্য বা সেবা ক্রয়ে প্ররোচিতকরণ বা ধারণা প্রদানে সহায়তা প্রদান করা হয়, তাকে ব্যক্তিক বিক্রয় বলে।”

পরিশেষে বলা যায় যে, বিক্রয়কর্মী কর্তৃক ব্যক্তিগত উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে গ্রাহকদের উদ্বুদ্ধ করে ক্রেতায় রূপান্তর করার কৌশলকে ব্যক্তিক বিক্রয় বলে।

২। বিক্রয়কর্মী নির্বাচন কাকে বলে?

উত্তর: বিক্রয়কর্মী সংগ্রহের একটি স্তর হচ্ছে বিক্রয়কর্মী নির্বাচন। আবেদনকারী প্রার্থীদের মধ্যে থেকে কাজের জন্য যোগ্য ব্যক্তিদের নির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ পাঠানো বা সরাসরি কাজে যোগদানের ছাড়পত্র প্রদান করাকে বিক্রয়কর্মী নির্বাচন বলে। নিচে বিক্রয়কর্মী নির্বাচনের প্রামাণ্য সংজ্ঞা তুলে ধরা হলো:

এম.এ. দৌলা-এর মতে, “বিক্রয়কর্মী নির্বাচন মূলত এমন একটি বিজ্ঞাপন, যা সম্ভাব্য ক্রেতাকে সম্ভবতঃ পণ্য গ্রহণে আকৃষ্ট করার সাথে সম্পর্কিত করা হয়।”

S. A Sherlekar-এর মতে, “আবেদনকারীদের পর্যবেক্ষণ ও মনোনীত করার জন্য তথ্য সংগ্রহ, তথ্য মূল্যায়ন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাকে নির্বাচন প্রক্রিয়া বলে।”

পরিশেষে উপরোক্ত সংজ্ঞার আলোকে বলা যায় যে, বিক্রয়কর্মী নির্বাচন বিক্রয়কর্মী সংগ্রহের একটি স্তর।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। ব্যক্তিক বিক্রয়ের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।

ব্যক্তিক বিক্রয়ের গুরুত্ব আলোচনা: ব্যক্তিক বিক্রয়কে ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন নামে অভিহিত করা যায়। কারণ, সম্ভাব্য ক্রেতাদের নিকট পণ্য সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে উপস্থাপন করে পণ্য ক্রয়ে আগ্রহী করে তোলাই বিক্রয়কর্মীর মুখ্য কাজ। নিম্নে ব্যক্তিক বিক্রয়ের গুরুত্ব আলোচনা করা হলো-

১. পণ্যের চাহিদা সৃষ্টি: বিপণনকারীর পক্ষে শুধুমাত্র বিজ্ঞাপনের দ্বারা পণ্যের ব্যাপক চাহিদা সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। একই সাথে মার্কেটিং প্রমোশনের অন্যান্য পন্থাও গ্রহণ করার প্রয়োজন হয়। ব্যক্তিক বিক্রয় প্রক্রিয়া সরাসরি ক্রেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে পণ্যের বাজার সৃষ্টি এবং বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে। ফলে বিপণনকারী প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে সচল রাখা সম্ভব হয়।

২. যোগাযোগ সৃষ্টি: পণ্যের বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য ব্যক্তিক বিক্রয় একটি বিশেষ ধরনের প্রক্রিয়া। বিক্রয়কর্মী উৎপাদক এবং ক্রেতাদের মধ্যে যোগাযোগের সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে। প্রমোশনের অন্যান্য হাতিয়ার দ্বারা ব্যাপক জনসাধারণকে পণ্য সম্বন্ধে অবহিত করে ব্যক্তিক বিক্রয়কার্য সম্পাদন করতে হয়।

৩. বাজার সম্প্রসারণ: ব্যক্তিক বিক্রয় এক ধরনের কৌশল যা পণ্যের বাজার সম্প্রসারণে সহায়তা করে। বিক্রয়কর্মী এরূপ কৌশল প্রয়োগ করে সম্ভাব্য ক্রেতাদের মনস্তত্বকে প্রভাবিত করে এবং তাদেরকে পণ্যের নিয়মিত ক্রেতায় পরিণত করে। এরূপ কার্যক্রমের ফলে পণ্যের ব্যাপক চাহিদা সৃষ্টি এবং বাজারের পরিধি দেশীয় সীমানা অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।
৪. তথ্যাবলি উপস্থাপন: নতুন অথবা পুরাতন পণ্যের গুণাবলি ও ব্যবহার বিধি বর্ণনার মাধ্যমে বিক্রয়কর্মী পণ্য ক্রয়ে ক্রেতাকে উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করে। বিক্রয়িকতার মাধ্যমে পণ্যের উৎকর্ষতা, তুলনামূলক উপযোগিতা, ব্যবহার বিধি, প্রতিষ্ঠানের তথ্যাবলি ইত্যাদিও উপস্থাপন করা হয়।
৫. নতুন পণ্য প্রবর্তন: বাজারে আগত নতুন পণ্য সম্বন্ধে সম্ভাব্য ক্রেতাদেরকে জানানো বিক্রয় উদ্যোগের একটি অন্যতম কাজ। এরূপ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উপর পণ্যের বিক্রয় নির্ভর করে। তাছাড়া, মানসিক কারণেও অনেক সময় সদ্য আগত পণ্য গ্রহণে ক্রেতারাজী থাকে না। ব্যক্তিক বিক্রয়ের মাধ্যমে সরাসরি ক্রেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে পণ্য সংক্রান্ত বিষয় তুলে ধরা সম্ভব হয়। তাই নতুন পর্যায়ে ক্রেতাদেরকে পণ্য ক্রয়ে প্ররোচিত করার জন্য ব্যক্তিক বিক্রয় অন্যতম কৌশল হিসেবে বিবেচিত হয়।
৬. চাহিদার স্থিতিশীলতা রক্ষা: নতুন পণ্যের আবির্ভাব অথবা প্রতিযোগী পণ্যের বিক্রয় প্রসারমূলক কার্যক্রম গ্রহণের ফলে চাহিদা হ্রাস পেতে পারে। এরূপ অবস্থায় দক্ষ বিক্রয়কর্মী বিক্রয়কৌশল প্রয়োগ করে নিজ পণ্যের চাহিদা অব্যাহত রাখতে ভূমিকা পালন করতে পারে।
৭. প্রতিযোগিতা মোকাবেলা: বর্তমান তীব্র প্রতিযোগিতামূলক বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য সুষ্ঠু ও পরিকল্পিত পন্থায় বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালনা অপরিহার্য। এক্ষেত্রে বিক্রয়কর্মীর অভিজ্ঞতা, দক্ষতা এবং উপস্থিত বুদ্ধি বিশেষ সহায়ক হয়। তাই বলা যায়, প্রতিযোগিতা মোকাবেলায় ব্যক্তিক বিক্রয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
৮. মুনাফা বৃদ্ধি: বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বাজারে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি দ্বারা প্রতিষ্ঠানের মুনাফা বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়। একারণে ক্রেতাদের সম্ভ্রুতি বিধানের মাধ্যমে বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি দ্বারা মোট মুনাফা বৃদ্ধি করতে হয়। ব্যক্তিক বিক্রয় মুনাফা বৃদ্ধিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখে।
৯. সম্পর্ক ও সহযোগিতা সৃষ্টি: বিক্রয়কর্মীর ব্যবহার এবং আচরণ পণ্য বিক্রয়ে সহায়তা করে। আন্তরিক আচরণ এবং মধুর ব্যবহার ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক সৃষ্টি করতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে পণ্য ক্রয়ের সিদ্ধান্তগ্রহণে ক্রেতারাজী সহযোগিতা গ্রহণ করে। এছাড়া অনেক ক্ষেত্রে পারিবারিক সম্পর্ক সৃষ্টিতেও বিক্রয়কর্মীর ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়।
১০. আস্থা স্থাপন : ব্যক্তিক বিক্রয় ক্রেতাদের নিকট প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস এবং সংক্রান্ত তথ্যাদি তুলে ধরে পণ্যের উৎকর্ষতা এবং প্রাপ্তির বিষয়ে নিশ্চয়তা প্রদান করে। এভাবে প্রতিষ্ঠান এবং পণ্য সম্বন্ধে একটি অনুকূল ভাবমূর্তি গড়ার চেষ্টা করা হয়। এরূপ প্রচেষ্টা প্রতিষ্ঠান এবং পণ্যের প্রতি ক্রেতাদের আস্থা স্থাপনে সহায়ক হয়, যা প্রকারান্তরে পণ্যের বিক্রয় বৃদ্ধি করে।
১১. তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ: ব্যক্তিক বিক্রয় প্রক্রিয়ায় ক্রেতার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ সৃষ্টি হয় বিধায় ক্রেতার পছন্দ, রুচি, চাহিদা, ফ্যাশন পরিবর্তন ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। সংগৃহীত তথ্যাবলির ভিত্তিতে বিক্রয়ধারা বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যতে পণ্যের পরিবর্তন বা উন্নয়ন সম্বন্ধে পরামর্শ প্রদান করা সম্ভব হয়।
১২. কর্মসংস্থান: ব্যক্তিক বিক্রয় প্রক্রিয়া একটি পেশা হিসেবে স্বীকৃত। এ প্রক্রিয়ায় জড়িত ব্যক্তিগণ কর্মসংস্থানের দ্বারা নিজেদের আর্থিক অবস্থার উন্নতির সাথে সাথে ক্রেতাদেরও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করে থাকে। বিক্রয়িকতার প্রভাবে পণ্যের উৎপাদন এবং বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। বিক্রয় বৃদ্ধির ফলে ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ভোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় নতুন শিল্প কারখানা স্থাপিত হয়। ফলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়।
- উপরোক্তভাবে আমরা ব্যক্তিক বিক্রয়ের গুরুত্ব আলোচনা করতে পারি।
- ২। একজন আদর্শ বিক্রয়কর্মীর গুণাবলি আলোচনা কর।
- উত্তর: পেশাদার বিক্রয়কর্মী বলতে ঐ সকল বিক্রয়কর্মীকে বুঝায়, যাদের মাধ্যমে ক্রেতাগণ নির্দেশ, উপদেশ ও সেবা ইত্যাদি পাওয়ার মাধ্যমে পর্যাণ্ট সম্ভ্রুতি পেয়ে থাকে। এদের মাধ্যমে বিক্রেতা, ডিলার ও উৎপাদনকারীগণ উপকার পেয়ে থাকেন। একজন পেশাদার বিক্রয়কর্মীর বিভিন্ন গুণাবলি নিচে তুলে ধরা হলো:-
- ১। সুদর্শন চেহারা: বিক্রয়কর্মীর ব্যক্তিত্ব নির্দর্শন হিসাবে বিক্রেতার চেহারাই সর্বপ্রথমে ক্রেতাদের নজরে পড়ে। বিক্রেতাকে সর্বদা আকর্ষণীয় চেহারা রাখার জন্য প্রকৃতি প্রদত্ত সত্তা ছাড়া নিজ প্রয়োজন অনুসারে কৃত্রিমভাবে বিকশিত চেতনার প্রতীক হিসেবে জাহির করতে হয়।
- ২। সুস্বাস্থ্য: উত্তম বিক্রয়কর্মীর স্বাস্থ্যবান হওয়া উচিত। তাকে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া এবং কর্মক্ষম হওয়া একান্ত প্রয়োজন।
- ২। আত্মবিশ্বাস : আত্মবিশ্বাস হলো সকল সাফল্যের চাবিকাঠি। আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ়প্রত্যয় নিয়ে যে কোন কাজ মনোযোগ সহকারে করতে থাকলে সাফল্য অবশ্যম্ভাবী। বিক্রয়কর্মীকে যে কোন অবস্থায় ঘাবড়ালে বা ভীত হলে চলবে না। যে কোন ধরনের প্রতিযোগিতা, সমালোচনা ও সমস্যাকে উপেক্ষা করে তাকে নিজের কাজে ব্রতী হতে হবে।
- ৩। আন্তরিকতা : বিক্রয়কর্মীকে আন্তরিকভাবে ক্রেতাদের সেবা করতে হবে। তাকে স্মরণ রাখতে হবে, “বিক্রয় নয় সেবা দান করাই তার কাজ।” এজন্য সর্বান্তকরণে ক্রেতার প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বিক্রয় করতে হবে।
- ৪। দৃঢ়প্রত্যয় : দৃঢ়প্রত্যয় বা স্থিরসংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য হল কৃতকার্য হবার মেরুদণ্ড। বিক্রেতার মধ্যে দৃঢ়প্রত্যয় না থাকলে সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হবে। দৃঢ়প্রত্যয়ের সাথে কঠিন পরিশ্রম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। যে পণ্য তিনি বিক্রয় করছেন এর উপর তার নিজের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা থাকা উচিত।
- ৫। নির্ভরযোগ্যতা : কথায় বলে- সত্যতা, বিশ্বস্ততা ও নির্ভরযোগ্যতাই হল খাঁটি ব্যবসায়ের প্রধান মূলধন। বিক্রয় ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এই ধারণা একান্তভাবেই প্রযোজ্য। বিক্রয়কর্মীর উপর যদি ক্রেতা আস্থা স্থাপন করতে না পারে, তবে তার উপর নির্ভর করতেও ব্যর্থ হবে। নির্ভরযোগ্যতা বিক্রয়বিদ্যার এক অন্যতম অঙ্গ হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে।
- ৬। উদ্যোগ : বিক্রয়কর্মীকে উদ্যোগী হতে হবে। উদ্যোগের বলেই সে তার অস্তিত্ব লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে। তার কার্যদক্ষতা, গুণ ও প্রশংসা এই সমস্ত সহজ বৈশিষ্ট্য মনে পোষণ করে বিক্রয় পেশাকে উত্তীর্ণ করে বিক্রয়কর্মী নিজ পদোন্নতি ও সুনাম অর্জনের চেষ্টা করবে।
- ৭। কল্পনাশক্তি : বিক্রয়কর্মী কল্পনাশক্তির বলে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অবহিত হতে পারে। তিনি নিজেকে ক্রেতা হিসাবে যদি ধরে নেন, তাহলে বুঝতে পারবেন কোন পরিস্থিতিতে কী ধরনের আচরণ, কথাবার্তা একজন ক্রেতার মনোরঞ্জন হবে কী হবে না। কোন বিশেষ মুহূর্তে কী ধরনের সাধারণত আচরণ একজন বিক্রেতার হৃদয়কে জয় করবে তা তিনি নিজ পদ্ধতিতে কল্পনা করলে বুঝতে পারবেন।
- ৮। তীক্ষ্ণবোধ : তীক্ষ্ণবোধ একটি মানসিক গুণ। যে কোন অস্বাভাবিক অবস্থাতেও বিক্রয়কর্মীকে কারবারের মূল লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন। বিভিন্ন অবস্থা ও পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে যখন যেমন তখন তেমন কাজ করতে হবে। বিচিত্র মনোভাবসম্পন্ন লোকের সাথে সাধারণত সব সময় বৈষম্যমূলক আচরণের দ্বারা প্রত্যেককেই সম্ভ্রুত রাখতে হবে।
- ৯। পণ্যসংক্রান্ত জ্ঞান : বিক্রীত পণ্যসংক্রান্ত পর্যাণ্ট জ্ঞান বিক্রয়কর্মীর জন্য অপরিহার্য। তাকে দোকানের সমস্ত পণ্য সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর রাখতে হবে। পণ্যের গুণ, মূল্য, উৎপত্তি, উপযোগিতা, ব্যবহারবিধি, স্থায়িত্ব, বাধা ইত্যাদি বিষয়ে বহুবিধ প্রশ্ন যে কোন সময় ক্রেতাসাধারণ তাকে জিজ্ঞেস করতে পারে।

১০। মোহনীয় ব্যক্তিত্ব : ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি সর্বত্রই সমাদৃত হয়ে থাকে। দক্ষ বিক্রয়কর্মীর এটিও একটি অপরিহার্য গুণ। এটা তাকে বিক্রয়কার্যে সফলতা অর্জনের জন্য প্রভূত সহায়তা করে থাকে।

উপরোক্তভাবে আমরা একজন আদর্শ বিক্রয়কর্মীর গুণাবলীগুলো আলোচনা করতে পারি।

অধ্যায়-০৭: বিক্রয় প্রসার

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। বিক্রয় প্রসার কাকে বলে?

উত্তর: বিপণন প্রসার বা বিক্রয় প্রসার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পণ্য উৎপাদন পরিকল্পনা, পণ্যের মূল্য নির্ধারণ এবং বন্টন এইসব বিপণন কার্যাবলী অন্তর্ভুক্ত। পণ্যের বাজার সৃষ্টির জন্য প্রকৃত ভোক্তা ও পুনঃবিক্রেতাদের অবহিত করে পণ্যটি ক্রয়ে ক্রেতাদের আগ্রহী করে তুলবার জন্য যে উপায় বা কৌশল ব্যবহার করা হয় তাকে বিপণন প্রসার বলে। তাই বলা যায়, বিজ্ঞাপন, প্রচার ও ব্যক্তিক বিক্রয় ছাড়া বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য যেসব কর্মকাণ্ড গ্রহণ করা হয় তাকে তাকে বিক্রয় প্রসার বলে।

Philip Kotler-এর মতে, “পণ্য বা সেবা ক্রয়-বিক্রয়ে উৎসাহিত করার জন্য স্বল্পমেয়াদে প্রণোদনা দান করাকে বিক্রয় প্রসার বলে।”

উপরের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করে চূড়ান্তভাবে বলা যায়, উৎপন্ন পণ্যসামগ্রী বিক্রয়ের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ, লিখিত ও অলিখিত যাবতীয় প্রচেষ্টার ফলে বিক্রেতা ক্রেতাকে স্বমতে আনয়নের চেষ্টা করে সম্ভাব্য ক্রেতাকে বাস্তব ক্রেতায় পরিণত করে তাদের সমুদয় কার্যবলিই বিক্রয় প্রসার কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত।

২। বাট্টা কী?

উত্তর: বিক্রয় প্রসারের লক্ষ্যে কারবার প্রসার হাতিয়ার হিসাবে উৎপাদনকারী সবারই বাট্টা প্রদান করে। সাধারণ অর্থে, কোনো বস্তুর নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে ক্রয় সম্ভব হলে, যতটুকু মূল্য কম পরিশোধ করা হলো, তাই বাট্টা। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে এই বাট্টা দেওয়া ও পাওয়া উভয় হয়ে থাকে।

Philip Kotler-এর মতে, “নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পণ্য ক্রয়ের ফলে সরাসরি মূল কমালে তাকে বাট্টা বলে।”

এককথায় বলা যায় যে বাট্টা বা Discount ক্রেতা কে বিক্রেতা দেয় তার সাথে সু সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। বিক্রয় প্রসারের কৌশল বা পন্থাসমূহ আলোচনা কর।

উত্তর: বিক্রয় প্রসারের কৌশল/পন্থাসমূহ: বিক্রয় প্রসার কর্মসূচির মূখ্য উদ্দেশ্যেই হলো পণ্যের বিক্রয় বৃদ্ধি করা। তাই উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে বিক্রয় প্রসারের কৌশল বা পন্থাগুলোকে দু'ভাবে বিভক্ত করা হয়; যথা-

(i) ভোক্তাকেন্দ্রিক বিক্রয় প্রসার ও (ii) ব্যবসায়িক বিক্রয় প্রসার।

নিম্নে উক্ত প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

(i) ভোক্তাকেন্দ্রিক বিক্রয় প্রসার: উৎপাদক বা মধ্যস্থ ব্যবসায়ী কর্তৃক চূড়ান্ত ভোক্তাদেরকে নির্দিষ্ট পণ্য বা সেবা ক্রয়ে উদ্বুদ্ধ করার জন্য গৃহীত বিক্রয় প্রসার পন্থাকে ভোক্তাকেন্দ্রিক বিক্রয় প্রসার বলে। নিম্নে ভোক্তাকেন্দ্রিক বিক্রয় প্রসারের পন্থাগুলো আলোচনা করা হলো:

১. সৌজন্যপণ্য বিতরণ: যদি কোনো প্রতিষ্ঠান নতুন ব্র্যান্ডের পণ্য বাজারে উপস্থাপন করতে চায়, তাহলে উক্ত প্রতিষ্ঠান নতুন ব্র্যান্ডের পণ্যের সাথে সম্পর্কিত কোনো পছন্দসই পণ্য বিনামূল্যে ক্রেতাদেরকে প্রদান করতে পারে। এতে নতুন পণ্য সম্পর্কে ক্রেতাদের মনে আগ্রহের সৃষ্টি হয়। যেমন, নতুন টুথব্রাশ-এর বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য টুথপেস্টের সাথে বিনামূল্যে টুথব্রাশ প্রদানের ব্যবস্থা করা যায়।

২. নমুনাপণ্য বিতরণ: ভোক্তাদেরকে নির্দিষ্ট পণ্য সীমিতভাবে বিনামূল্যে প্রদানের ব্যবস্থাকে নমুনাপণ্য বিতরণ পদ্ধতি বলে। যদি উৎপাদক নিশ্চিত থাকে যে, ক্রেতার পণ্য গ্রহণ করবে এবং পছন্দ করলে পুনরায় ব্যবহার করবে, তাহলেই নমুনা বিতরণ পদ্ধতির ব্যবহার করা হয়।

৩. অর্থ ফেরত: ভোক্তা এবং খুচরা ব্যবসায়ী উভয় ক্ষেত্রেই ভোক্তারা মোড়কে উল্লিখিত মূল্যে পণ্য ক্রয় করে এবং ক্রয়ের নিশ্চয়তারূপ পণ্যের লেবেল বা মোড়ক উৎপাদকের নিকট ফেরত দেয়। উৎপাদক মোড়কের উল্লিখিত মূল্যের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ভোক্তাদেরকে ফেরত প্রদান করে।

৪. মেয়াদি গ্যারান্টি প্রদান: নতুন পণ্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রে মেয়াদি গ্যারান্টি অত্যন্ত ফলদায়ক পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে উৎপাদক নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য পণ্যের স্থায়িত্ব বা কর্মক্ষমতা বিষয়ে নিশ্চয়তা প্রদান করে। এর মধ্যে পণ্যের কোনো ত্রুটি দেখা গেলে বা পণ্য বিনষ্ট হলে উৎপাদক পণ্যটি ফেরত নিয়ে আরেকটি নতুন পণ্য ক্রেতাকে প্রদান করে অথবা মেরামত করে দেয়। এ ধরনের গ্যারান্টি ক্রেতাদের মনে পণ্য সম্বন্ধে আস্থার সৃষ্টি করে এবং তারা পণ্য ক্রয়ে উদ্বুদ্ধ হয়। ইলেকট্রনিক্স দ্রব্য বিপণনের ক্ষেত্রে এরূপ পদ্ধতির ব্যবহার লক্ষণীয়।

৫. মূল্যহ্রাস কুপন : প্রচলিত মূল্য অপেক্ষা কিছুটা মূল্য ছাড় দিয়ে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য কুপন প্রদান প্রচলিত পণ্যের বিক্রয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এক্ষেত্রে পণ্যের উৎপাদক সংবাদপত্র বা ম্যাগাজিনে বিজ্ঞাপন প্রদানের মাধ্যমে কুপন প্রদান করে এবং ক্রেতার কুপন জমা দিয়ে কুপনে উল্লিখিত কম মূল্যে পণ্য সংগ্রহ করে।

৬. মূল্যহ্রাস মোড়কিকরণ: এ পদ্ধতি মূল্যহ্রাস কুপন পদ্ধতির অনুরূপ। তবে এক্ষেত্রে কুপনের পরিবর্তে পণ্যের মোড়কে মূল্য ছাড়-এর পরিমাণ উল্লেখ থাকে। ক্রেতার নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য পণ্যের নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে পণ্য ক্রয় করতে পারে। আমাদের দেশে বিশেষ করে সাবান, ওয়াশিং পাউডার, টুথপেস্ট ইত্যাদির ক্ষেত্রে এরূপ পদ্ধতির ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

৭. বিক্রয়োত্তর সেবা: সেবামূলক পণ্যের বিক্রয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ও প্রতিযোগিতা মোকাবেলায় ভোক্তাকে পণ্য বা সেবা ক্রয়ের পর বিনামূল্যে বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদানের নিশ্চয়তা দেয়া হয়। এক্ষেত্রে মেয়াদি গ্যারান্টির ন্যায় কোনো মেয়াদ নির্দিষ্ট থাকে না। যেকোনো সময়ে ক্রেতার এরূপ সেবাগ্রহণ করতে পারে। টিভি, রেফ্রিজারেটর ইত্যাদি পণ্যের ক্ষেত্রে বিক্রয়োত্তর সেবা অপরিহার্য বলে বিবেচিত হয়।

৮. প্রদর্শনী এবং মেলা: পণ্যের বাজার বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন সময়ে দেশের অভ্যন্তরে ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রদর্শনী ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এসব প্রদর্শনী ও মেলার স্পর্শক হয়েও প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি তুলে ধরা যায়। এ ছাড়া প্রদর্শনী ও মেলাতে স্টল খুলে পণ্যের প্রতি ভোক্তাদের আগ্রহ বৃদ্ধি এবং সেই সঙ্গে বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব হয়।

(ii) ব্যবসায়িক বিক্রয় প্রসার: মধ্যস্থ ব্যবসায়ীদেরকে প্রতিষ্ঠানের পণ্য বিক্রয়ে উদ্বুদ্ধ করার জন্য গৃহীত বিক্রয় প্রসার পন্থাকে ব্যবসায়িক বিক্রয় প্রসার বলে। এক্ষেত্রে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১. বিশেষ পুরস্কার: যে সকল মধ্যস্থ ব্যবসায়ী প্রথম বারের মতো অথবা একত্রে অধিক পরিমাণে পণ্যের অর্ডার প্রদান করবে তাদের জন্য বিশেষ আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

২. ব্যবসায়িক ছাড়: মধ্যস্থ ব্যবসায়ীরা যাতে নির্দিষ্ট উৎপাদনকারীর পণ্য বিশেষভাবে প্রদর্শন করে এবং পণ্য বিক্রয়ের জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা গ্রহণ করে, সেজন্য তাদেরকে বিশেষ ব্যবসায়িক ছাড় প্রদান করা হয়। যেমন, মধ্যস্থ ব্যবসায়ীদের জন্য ৫% কমিশন বৃদ্ধি।

৩. সহযোগিতামূলক বিজ্ঞাপন: পণ্য বিক্রয়ে উৎসাহিত করার জন্য বিজ্ঞাপন ব্যয়ের নির্দিষ্ট অংশ উৎপাদনকারী বহন করে। এরূপ সহযোগিতা প্রদানের ফলে খুচরা ব্যবসায়ীরা অধিক পণ্য বিক্রয়ের প্রচেষ্টা গ্রহণ করে থাকে।

৪. বিনামূল্যে পণ্য প্রদান: মধ্যস্থ ব্যবসায়ীরা যাতে অধিক পরিমাণে পণ্য ক্রয় করে সে জন্য অতিরিক্ত পণ্য ক্রয়ের ওপর কিছু পণ্য তাদেরকে বিনামূল্যে প্রদান করা হয়। এরূপ কার্যক্রম উৎপাদকদের পণ্যের বিক্রয় বৃদ্ধির সহায়ক হয়।

৫. প্রতিযোগিতা: মধ্যস্থ ব্যবসায়ীদের মধ্যে বা কোম্পানির নিজস্ব বিক্রয়কর্মীদের মধ্যে পণ্য-বিক্রয় প্রতিযোগিতার আয়োজন বিক্রয় প্রসারে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের বিশেষ পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করা হলে প্রতিষ্ঠানের পণ্য বিক্রয়ের প্রতি ব্যবসায়ীদের অধিক আগ্রহের সৃষ্টি করে।

উপসংহারে বলা যায়, ভোক্তা বা ক্রেতাদের কোনো পণ্য ক্রয়ে উৎসাহদানের জন্য বিজ্ঞাপন ও ব্যক্তিক বিক্রয়ের বাইরে বৈষয়িক বিভিন্ন সহযোগিতা বা সাময়িক কোনো কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে বিক্রয় প্রসার ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে কোন পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে তা বিশেষভাবে পণ্যের প্রকৃতি ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে।

২। বাংলাদেশে বহুল ব্যবহৃত ও জনপ্রিয় বিক্রয় প্রসার কৌশলসমূহ আলোচনা কর।

উত্তর: ভূমিকা : মূলত বাংলাদেশের জনসংখ্যা বেশি হওয়ায় বাজার বৃহৎ। পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়ে বিক্রেতাদের প্রাধান্য থাকায় তারা পণ্যের বিক্রয় বৃদ্ধিতে বিক্রয় প্রসার কার্যক্রম তেমনভাবে গ্রহণ করে না। তবে, বর্তমানে মুক্ত বাজার অর্থনীতির প্রচলনে বিদেশি পণ্যের আগমন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমতাবস্থায় আকর্ষণীয় এবং উচ্চ গুণাবলিসম্পন্ন পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলো ইদানিং কতিপয় পণ্যের ক্ষেত্রে বিক্রয় কার্যক্রম গ্রহণ করছে। তা ছাড়া বাজারে বিক্রেতাদের প্রাধান্য থাকায় এ ধরনের কার্যক্রম অত্যন্ত সীমিত।

বাংলাদেশে অনুসৃত বিক্রয় প্রসার কৌশল/হাতিয়ার : বাংলাদেশের বাজারজাতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যেসব বিক্রয় প্রসার কৌশল বা হাতিয়ারসমূহ অনুসৃত হয় সেগুলো নিম্নে আলোচনা করা হল :

১। বিনামূল্যে নমুনা বিতরণ : অধিক প্রতিযোগিতাপূর্ণ বাজারের নতুন পণ্য পরিচিতি এবং পণ্যের প্রতিযোগিতামূলক বাজার দখলের জন্য ক্রেতা-ভোগকারীদের নিকট বিনামূল্যে পণ্যের নমুনা বিতরণ করা যেতে পারে। সাধারণত প্রসাধনী, সিগারেট, বিড়ি ইত্যাদি পণ্যের ক্ষেত্রে নমুনা বিতরণ এবং বইয়ের ক্ষেত্রে সৌজন্য সংখ্যা প্রদান করে এরূপ বিক্রয় প্রচেষ্টা চালানো হয়। সাধারণত এ ব্যবস্থা ব্যয়বহুল। তাই অধিক মূল্যের পণ্যের ক্ষেত্রে নির্ধারিত সম্ভাব্য ক্রেতাদের মধ্যে নমুনা বিতরণ করা হয়।

২। জনসংযোগ : কল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ এবং রেডিও, টিভিতে প্রচারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান জনসংযোগ চালাতে পারে। এরূপ কার্যক্রমের মাধ্যমে বাজারে প্রতিষ্ঠান এবং তাদের উৎপাদিত পণ্য জনপ্রিয়তা লাভ করে। ফলে বিক্রয় বাড়ে।

৩। উপহার প্রদান : পণ্যের সাথে নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা কিংবা উপহার প্রদান করলে এসব সুযোগ সুবিধার প্রত্যাশায় নতুন-নতুন ক্রেতারা পণ্য ক্রয়ে উৎসাহিত হয়। ফলে বিক্রয় বাড়ে। এক্ষেত্রে বিক্রয় প্রসার পদ্ধতি হিসেবে পণ্যের সাথে ক্রেতাদের নানা ধরনের উপহার, কুপন ইত্যাদি প্রদান করা যেতে পারে।

৪। প্রদর্শনী ও মেলা : বিভিন্ন ধরনের মেলা ও প্রদর্শনীতে পণ্য প্রদর্শনের ব্যবস্থা করলে পণ্য প্রতিষ্ঠানে পরিচিত লাভ করে এবং উত্তরোত্তর বিক্রয় বাড়ে। তাই অনেক প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে পণ্য প্রদর্শনের ব্যবস্থা করে থাকে। এতে পণ্যের বিক্রয় বৃদ্ধি পায়।

৫। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজিত : ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বহু লোকের সমাগম হয়। তাই প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এরূপ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোক আমন্ত্রণ করা যেতে পারে। এতে প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সর্বসাধারণের সম্যক ধারণা লাভ হবে। এতে বিক্রয় প্রসারের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে।

৬। নববর্ষ উদযাপন : অনেক প্রতিষ্ঠান বছরের শুরুতে হালখাতা হিসেবে জাকজমকপূর্ণভাবে নববর্ষ উদযাপন করে। এসব অনুষ্ঠানে আপ্যায়নের পাশাপাশি বকেয়া মওকুফ এবং বিভিন্ন উপহারের ব্যবস্থা করা হয়। এতে গ্রাহকদের নিকট প্রতিষ্ঠানের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি সৃষ্টি হয় এবং প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় বাড়ে।

৭। মূল্য হ্রাস কৌশল : প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানের সাথে সুনাম বজায় রেখে কারবার পরিচালনা এবং অধিক বিক্রয়ের লক্ষ্যে মাঝে মধ্যে প্রতিষ্ঠান মূল্য হ্রাস কৌশল গ্রহণ করতে পারে। এতে সুনামের সাথে প্রতিষ্ঠান বিক্রয় প্রসার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হবে।

৮। পণ্য সজ্জা : দোকানে পণ্যসামগ্রী সুন্দর ও আকর্ষণীয়ভাবে সাজানো থাকলে ক্রেতারা সহজে পণ্যের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং পণ্য ক্রয় করে। তাই বিক্রয় প্রসারের কার্যকরী পন্থা হিসেবে পণ্য সজ্জা পণ্য বিক্রয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

৯। বিক্রয়োত্তর সেবা : সাম্প্রতিক কালে পণ্য সম্পর্কে ক্রেতা-ভোক্তাদের নিশ্চয়তা দানের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করে। সাধারণত যন্ত্রপাতি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এ পন্থা অবলম্বন করা হয়। তবে আধুনিককালে বিক্রয়োত্তর সেবা বিক্রয় প্রসারের ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে থাকে।

১০। শুভেচ্ছা বিনিময় : বিক্রয় প্রসারের চমৎকার ও উৎকৃষ্ট পন্থা হিসেবে ঈদ, বড় দিন, পূজা, নববর্ষ ইত্যাদি অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে সরাসরি কিংবা রেডিও, টেলিভিশন বা ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের মাধ্যমে শুভেচ্ছা বিনিময় করা যেতে পারে। এরূপ শুভেচ্ছা বিনিময়ের ফলে প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক সুনাম বৃদ্ধি পায় এবং বিক্রয় বাড়ে।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনা থেকে পরিশেষে বলা যায়, শুধুমাত্র ভোক্তা কর্তৃক পণ্যের বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য নয়, ব্যবসায়ীরা যাতে অধিক পরিমাণে পণ্য ক্রয় করে সেজন্যও বাজারজাতকারী প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন প্রসারমূলক কার্যক্রম গ্রহণ থাকে। কিন্তু প্রতিষ্ঠানগুলো নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিচ্ছিন্নভাবে এ ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করে বলে মেয়াদান্তে পদ্ধতির কার্যকারিতা অনেকাংশে হ্রাস পায়।

৩। বিক্রয় প্রসার কর্মসূচি উন্নয়নের পদক্ষেপসমূহ আলোচনা কর।

উত্তর: বিক্রয় প্রসার কর্মসূচির পরিপূর্ণ সংজ্ঞায়িতকরণে বাজারজাতকারীকে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। নিম্নে বিক্রয় প্রসার কর্মসূচির সিদ্ধান্তগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো :

১। প্রণোদনার আয়তন: বিক্রয় প্রসারের সফলতার জন্য ন্যূনতম প্রণোদনার প্রয়োজন হয়। সাধারণত ব্যাপক প্রণোদনা অধিকতর বিক্রয়ের সাড়া জাগায়। তাই এক্ষেত্রে বাজারজাতকারীকে প্রণোদনার আয়তন পরিমাপ করতে হবে। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, সুবিধার পরিমাণ বাড়ালে মুনাফার পরিমাণ হ্রাস পায়। তাই কাম্য আয়তনের প্রণোদনার ব্যবস্থা করে বিক্রয় প্রসার কর্মসূচির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

২। অংশগ্রহণের শর্ত: প্রণোদনার সুযোগ দেয়ার জন্য এক্ষেত্রে অংশগ্রহণের শর্ত নির্ধারণ করতে হবে। অর্থাৎ, প্রণোদনা সকলকে অথবা একমাত্র নির্বাচিত দলকে প্রদান করতে হবে, যেমন- কলেজের ছাত্রদের অর্ধেক ভাড়ায় যাতায়াতের ব্যবস্থা করা।

৩। প্রসার কার্যক্রম উন্নয়ন এবং বণ্টন: এক্ষেত্রে অভিস্রু ক্রেতা-ভোক্তার নিকট বিক্রয় প্রসার কর্মসূচি অর্পণের জন্য বণ্টন প্রণালি নির্ধারণ করতে হবে, যেমন- ক্যাশে, প্যাকেটে, ডাকযোগে বা বিজ্ঞাপন বাহনে কুপন বিক্রয়। কিন্তু বিভিন্ন স্তরে পৌঁছানোর জন্য প্রত্যেক বণ্টন প্রণালির সাথে খরচ জড়িত থাকে। তাই খরচ বিবেচনা করে বাজারজাতকারীকে বণ্টন মাধ্যম নির্বাচন করতে হবে।

৪। প্রসারের সময়কাল: বিক্রয় প্রসার কর্মসূচির সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। এক্ষেত্রে সময়কাল সংক্ষিপ্ত হলে সম্ভাব্য অনেক ক্রেতা পণ্য থেকে বঞ্চিত হবে। অন্যদিকে প্রসার কার্যক্রম অতি দীর্ঘ হলে ক্রেতাদের তাত্ক্ষণিক ক্রয় অভিপ্রায় জাগ্রত হবে না। তাই যথাযথ সময়কালের মধ্যে বিক্রয় প্রসারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। এতে প্রতিষ্ঠানের পক্ষে পণ্যের বিক্রয় সহজে বৃদ্ধি করা সম্ভবপর হবে।

৫। মূল্যায়ন : বিক্রয় প্রসার কর্মসূচি উন্নয়নে মূল্যায়ন অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। কিন্তু অনেক প্রতিষ্ঠান বিক্রয় প্রসার প্রোগ্রাম মূল্যায়নে ব্যর্থ হয়। ভোক্তার সতর্কতা, মনোভাব এবং কার্যক্রম ইত্যাদি বিক্রয় প্রসারের ফলাফল নির্ধারণ করা অত্যন্ত কঠিন। তবে কিছু প্রতিষ্ঠান বিক্রয় প্রসার প্রোগ্রাম ভাষা ভাষা বা অগভীরভাবে মূল্যায়নের চেষ্টা করে। এতে বিক্রয় প্রসার উন্নয়ন ব্যাহত হয়। এমতাবস্থায় প্রতিষ্ঠান কতকগুলো পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারে।

নিম্নে বিক্রয় প্রসার সিদ্ধান্ত মূল্যায়নের পদ্ধতিগুলো বর্ণনা করা হলো-

(ক) অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রমোশনের সাথে বিক্রয় তুলনা: এক্ষেত্রে বিক্রয় প্রসার কর্মসূচি বাস্তবায়নের পূর্বে একটি নির্দিষ্ট সময়ের সাথে বিক্রয়ের তুলনা করে দেখা হয়। এতে বিক্রয় প্রসারের সফলতা এবং ব্যর্থতা পরিমাপ করা সম্ভবপর হয়। কিন্তু অন্য কোনো উপাদান দ্বারা বিক্রয় প্রভাবিত হলে বিক্রয় প্রসার সফলতার সাথে পরিমাপ করা সম্ভবপর হয় না। যেমন- বিক্রয় প্রসারের পূর্বে কোনো প্রতিষ্ঠানের ৬% বাজার শেয়ার রয়েছে। প্রমোশনের সময় প্রতিষ্ঠানের বাজার শেয়ার ১০% এবং পরে ৫% বাজার শেয়ারের পতন ঘটল, কিন্তু পরবর্তীতে ৭% বৃদ্ধি পেল। এক্ষেত্রে বিক্রয় প্রসারী মনে করে, প্রতিষ্ঠান নতুন ক্রয়কারী আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে এবং বর্তমান ক্রেতাদের ক্রয়ের পরিমাণ বেড়েছে। কিন্তু প্রমোশনের পর মজুদ পণ্য ব্যবহার করায় ক্রেতাদের ক্রয়ের পরিমাণ কমছে। তা ছাড়া নতুন ক্রেতাদের অনেকে ব্র্যান্ডের প্রতি অনুগত হয়ে পড়ায় পরবর্তীতে নতুন ব্যবহারকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে প্রতিষ্ঠান দীর্ঘমেয়াদে ৭% বাজার শেয়ার বৃদ্ধি করতে সক্ষম হলো। কিন্তু বাজারে ব্র্যান্ডের শেয়ার পূর্ব অবস্থায় ফিরে গেলে সময়ের প্রয়োজনে প্রসার কৌশল পরিবর্তন করতে হবে।

(খ) ভোক্তা গবেষণা : ভোক্তা গবেষণার মাধ্যমে বিক্রয় প্রসার প্রোগ্রামের প্রতি ভোক্তার আকর্ষণ এবং আকর্ষণের কারণ জানা যায়। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান দুটি কৌশল ব্যবহার করতে পারে, যথা-

(i) জরিপ : জরিপের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ ও মানগত বিশ্লেষণ করা হয়। ফলে কতজন ভোক্তা প্রসার কর্মসূচি স্মরণ করতে পারে তা জানা সম্ভবপর হয়। ফলে বিক্রয় প্রসার কর্মসূচির প্রতি তাদের চিন্তা, সুবিধা গ্রহণের পরিমাণ, ক্রয় অভিপ্রায়ের প্রভাবের ধরন ইত্যাদি জানা সম্ভবপর হয়।

(ii) পরীক্ষা : বিক্রয় প্রসার কর্মসূচি মূল্যায়নে পরীক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে প্ররোচিতকরণ, মূল্য, দৈর্ঘ্য এবং বন্টন পদ্ধতির গুণ ও মানগত বিশ্লেষণ করা হয়। এতে সফলতার সাথে বিক্রয় প্রসার কর্মসূচি মূল্যায়ন করা সম্ভবপর হয়।

পরিশেষে বলা যায়; প্রমোশন মিশ্রণে বিক্রয় প্রসার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই বিক্রয় প্রসারের উদ্দেশ্য, সংজ্ঞায়িতকরণ, সর্বোত্তম হাতিয়ার নির্বাচন, বিক্রয় প্রসার প্রোগ্রামের নকশা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং ফলাফল পরিমাপ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। এতে কার্যকর বিক্রয় প্রসার কর্মসূচি গ্রহণ করে প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সফলতার সাথে বিক্রয়কার্য সম্পাদন করা সম্ভবপর হবে।

অধ্যায়-০৮: গণসংযোগ

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর

১। গণসংযোগ কাকে বলে?

উত্তর: গণসংযোগ হচ্ছে গণ-প্রমোশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার, যার মধ্যে প্রচারণাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত থাকে। অতএব, জনসাধারণের সুসম্পর্কে বজায় রেখে অনুকূল প্রচারণা লাভ, আইনগত ভাবমূর্তি তৈরি এবং প্রতিকূল প্রচারণা ও গুজব মোকাবিলা করার জন্য প্রতিষ্ঠান যেসব কার্যক্রম গ্রহণ করে, তাকে গণসংযোগ বলে।

Philip Kotler & Gary Armstrong-এর মতে, “কোম্পানি এবং বিভিন্ন জনগণের মধ্যে উত্তম সম্পর্ক সৃষ্টি, কর্পোরেট ভাবমূর্তি বৃদ্ধি এবং প্রতিকূল গুজব, গল্প ও ঘটনা নিষ্পত্তিকরণ বা মোকাবিলা করার জন্য অনুকূল যে প্রচারণা গ্রহণ করা হয়, তাকে গণসংযোগ বলে।”

Bovee, Houston & Thill-এর মতে, “গণসংযোগ হচ্ছে প্রসারতা, যা অর্থ প্রদান ছাড়া যোগাযোগের মাধ্যমে কোন কোম্পানি এবং তার পণ্যের প্রতি জনগণের মতামতকে প্রভাবিত করে।”

এম এ দৌলা-এর মতে, “কোন প্রতিষ্ঠানের প্রতি অনুকূল ভাবমূর্তি সৃষ্টি এবং বজায় রাখার উদ্দেশ্যে যেসব যোগাযোগ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় তাকে গণসংযোগ বলে।”

সুতরাং বলা যায় যে, গণসংযোগ কোন কোম্পানির প্রতি জনসাধারণের সমর্থন আদায়ের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমোশন হাতিয়ার।

রচনামূলক প্রশ্ন উত্তর

১। গণসংযোগের গুরুত্ব আলোচনা কর।

গণসংযোগের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা: গণসংযোগ একটি ব্যাপক ধারণা। তাই প্রচারণাসহ অন্যান্য অনেক কার্যক্রম এর আওতাভুক্ত থাকে। ফলে গণ-প্রমোশনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠান গণসংযোগ কার্যক্রম গ্রহণ করে। নিচে গণসংযোগের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করা হলো:-

১। বিশ্বাসযোগ্যতা: প্রমোশনের অন্যান্য হাতিয়ারের মতো গণসংযোগ বাণিজ্যিকভাবে ব্যাপকহারে ব্যবহৃত হয় না। তাই প্রতিষ্ঠানের বিশ্বাসযোগ্যতার সাথে এ হাতিয়ার ব্যবহার করে প্রসার কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে।

২। অল্প ব্যয়: গণসংযোগ কার্যক্রম বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহৃত হয় না। ফলে গণসংযোগ সম্পর্কে মানুষ অনুকূল ধারণা লালন করে। এত কম ব্যয়ে প্রসার কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভবপর হয়।

৩। বিশৃঙ্খলা পরিহার: গণসংযোগ সীমিত আকারে ও আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে কার্যক্রম পরিচালনা করে। তা ছাড়া এ ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ যোগাযোগের মাধ্যমে কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়। এত বিশৃঙ্খলা পরিহার করে কার্যসম্পাদন করা সম্ভবপর হয়।

৪। নেতৃত্ব দান: গণসংযোগের মাধ্যমে জনগণের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করে পণ্য বা সেবা সম্পর্কে তথ্য উপস্থাপন করা হয়। এতে অনেক সময় দেখা যায় গণসংযোগ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজনে তাত্ক্ষণিক উত্তরের ভূমিকা পালন করতে পারে।

৫। ভাবমূর্তি গড়ে তোলা: গণসংযোগ সরাসরি যোগাযোগ করে জনগণের সাথে প্রতিষ্ঠানের অনুকূল ভাবমূর্তি গড়ে তোলে। কখনও কখনও যে কোন অবাস্তবিক পরিস্থিতিতে এ ভাবমূর্তি ব্যবহার করে প্রতিষ্ঠান দ্রুত সমস্যা নিষ্পত্তি করতে পারে।

৬। মনোযোগ আকর্ষণ: পণ্য বা সেবার প্রতি ক্রেতা-ভোক্তার মনোযোগ আকৃষ্ট হলে পণ্য বিক্রয়ের প্রসার ঘটে। তাই পণ্য বা সেবার প্রতি ক্রেতা-ভোক্তা ও ব্যবহারকারীর মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য গণসংযোগ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

৭। পণ্য প্রচারণা: প্রচারণার মাধ্যমে পণ্য এবং পণ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্বন্ধে জনসাধারণ অবগত হতে পারে। এতে পণ্য বিক্রয় বাড়ে। তা ছাড়া প্রচারণা গণসংযোগের অভ্যন্তরীণ রূপ। তাই প্রচারণার উদ্দেশ্যেও অনেক সময় গণসংযোগ কার্যক্রম গৃহীত হয়ে থাকে।

৮। প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ধারণা: গণসংযোগের মাধ্যমে যে কোন প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। তাই অনেক সময় সাধারণত নিজেদের স্বার্থে প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ধারণা লাভের উদ্দেশ্যেও গণসংযোগ কার্যক্রম গৃহীত হতে পারে।

৯। গোপনীয়তা রক্ষা: গণসংযোগ ছাড়া অন্য কোন উপায়ে যোগাযোগ করে তথ্য আদান-প্রদান করলে তথ্যের গোপনীয়তা প্রকাশিত হতে পারে। তাই প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে তথ্য বা সংবাদ গোপন করার জন্য অনেক প্রতিষ্ঠান গণসংযোগ কার্যক্রম গ্রহণ করে।

১০। উপদেশ দান: প্রতিষ্ঠানের অবস্থা ও ভাবমূর্তি এবং জনসাধারণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে ব্যবস্থাপনাকে উপদেশ দানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে। এমতাবস্থায় গণসংযোগের মাধ্যম ব্যবস্থাপনাকে অনেক সময় উপদেশ দেয়া যেতে পারে।

সুতরাং দেখা যায়, আলোচিত উদ্দেশ্যকে অত্যন্ত সার্থক ও সুকৌশলে মোকাবিলা করার জন্য বর্তমানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গণসংযোগ কার্যক্রম গ্রহণ করে প্রতি বছর বিপুল অর্থ খরচ করে থাকে।

২। গণসংযোগের হাতিয়ারসমূহ আলোচনা কর।

উত্তর: গণসংযোগের হাতিয়ারসমূহ : গণসংযোগ প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ব্যাপক একটি যোগাযোগ মাধ্যম। তাই বিভিন্ন হাতিয়ার ব্যবহার করে গণসংযোগ কার্যক্রমের মাধ্যমে বিবিধ উদ্দেশ্য অর্জন করা যায়। গণসংযোগে ব্যবহৃত হাতিয়ারগুলো নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল-

১। প্রকাশনা : অনেকসময় কোম্পানি নতুন পণ্য উন্নয়ন, কর্মীদের পদোন্নতি, কোম্পানির নীতি পরিবর্তন ও অন্যান্য তথ্য সম্বলিত অভ্যন্তরীণ নিউজ-লেটার প্রকাশ করে থাকে। এসব প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের কর্মী, মধ্যস্থকারবারি এবং ক্রেতা-ভোক্তার নিকট বিলি করা হয়। এতে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কর্মী ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পক্ষ কোম্পানির অভ্যন্তরীণ ঘটনাবলি সম্পর্কে অবহিত হতে পারে।

২। সামাজিক কার্যক্রম : কোম্পানি সামাজিক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার সামাজিক কাজকর্ম যেমন- এতিমখানা স্থাপন, পরিবেশ সংরক্ষণ, বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান ইত্যাদি কার্যসম্পাদন করতে পারে। এছাড়া বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানে আর্থিক অনুদানের মাধ্যমে কোম্পানি সামাজিক কাজ কর্মে অংশগ্রহণও করতে পারে।

৩। চলচ্চিত্র : চলচ্চিত্রের মাধ্যমে কোম্পানির ইতিহাস, বিনোদন ও জনসেবা সংক্রান্ত তথ্য ক্রেতাদের নিকট পৌঁছানো যায়। এ সকল চলচ্চিত্র অনেকসময় সিনেমা হল বা টেলিভিশন কিংবা প্রজেক্টরের মাধ্যমে দর্শক শ্রোতাদের নিকট প্রদর্শন করা হয়। এতে প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জনগণের অনুকূল ভাবমূর্তি গড়ে ওঠে।

৪। পরামর্শদাতা : সংগঠনের বাইরে গণসংযোগ পরামর্শদাতা গণসংযোগ কর্মসূচি উন্নয়ন ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করে। ফলে কোম্পানি এবং পেশাদার সংগঠনের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। তা ছাড়া বিশেষ প্রকল্প চলাকালে এ সম্পর্ক বা সংযোগ আরও জোরদার হয়।

৫। প্রদর্শনী ও মেলা : কোম্পানি গণসংযোগের হাতিয়ার হিসেবে কোম্পানি এবং কোম্পানির পণ্যসামগ্রী সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার জন্য প্রদর্শনী ও মেলায় অংশগ্রহণ করে থাকে। তা ছাড়া কোম্পানি বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ করে। এতে কোম্পানির বিক্রি বাড়ে এবং কোম্পানির ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

৬। বিশেষ ঘটনা : বিশেষ ঘটনার মাধ্যমে কোম্পানি জনসাধারণের নিকট পরিচিতি লাভ করতে পারে। এতে কোম্পানির ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, যার ফলে পরবর্তী সময়েও এ সুনাম বজায় রাখার চেষ্টা করতে পারে।

৭। প্রচারণা : প্রচার গণসংযোগ কার্যক্রমে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। তাই প্রচারকে গণসংযোগের গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

৮। কর্পোরেট বিজ্ঞাপন: মূলত যে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি তৈরি করে তা ধরে রাখা এবং পরবর্তী পর্যায়ে তা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করা হয়, তাকে প্রাতিষ্ঠানিক বা কর্পোরেট বিজ্ঞাপন বলে। কর্পোরেট বিজ্ঞাপন গণসংযোগের অন্যতম একটি হাতিয়ার হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

৯। পরিচিতিমূলক কার্যক্রম: জনসাধারণের নিকট দৃশ্যমান পরিচিতিমূলক উপকরণ তুলে ধরে তাৎক্ষণিক স্বীকৃত আদায়ের প্রচেষ্টা চালানো হয়। সাধারণত কোম্পানির লগো, স্টেশনারি, ইউনিফর্ম ইত্যাদির মাধ্যমে জনসাধারণের নিকট কোম্পানির পরিচিতি তুলে ধরা হয়।

১০। অনলাইনে যোগাযোগ: বর্তমানে অনলাইন যোগাযোগ গণসংযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এক্ষেত্রে ইমেইল, ইন্টারনেট, টেলি-কমিউনিকেশন ইত্যাদির মাধ্যমে অতি দ্রুত ক্রেতার সাথে তথ্যের আদান-প্রদান সম্ভব হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, গণযোগাযোগের বিভিন্ন হাতিয়ার কোম্পানির ও জনগোষ্ঠীর সাথে উত্তম যোগাযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৩। বাংলাদেশে গণসংযোগ পেশার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ।

উত্তর: বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে গণসংযোগ পেশার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ : গণসংযোগ পেশা বর্তমানে একটি চাহিদাসম্পন্ন পেশা। এ পেশা, বাজারজাতকরণ কর্মসূচির একটি বিশাল তাৎপর্যপূর্ণ উপাদান, কেননা পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতার সাথে সংযোগ স্থাপনে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। নিম্নে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে গণসংযোগ পেশার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো :

বাজারজাতকরণ প্রতিষ্ঠানগুলো ক্রেতাসাধারণের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনের লক্ষ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে। ক্রেতাসাধারণ যাতে প্রতিষ্ঠানের পণ্য সম্পর্কে ভালো মনোভাব পোষণ করে সেজন্য বিভিন্ন কোম্পানি গণসংযোগ কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। আমাদের দেশের প্রতিটি ঘরে রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, সিনেমা, ভিসিআর, ইত্যাদি গণমাধ্যমগুলোও তথ্যের আদান-প্রদানে কার্যকরী ভূমিকা রাখছে। উপরন্তু এদেশের শহর ও গ্রামে প্রচলিত নাট্যনুষ্ঠান, যাত্রাভিনয়, লোকসংগীত, কবিগানের আসর, পালা গানের আসর ইত্যাদি আজও গণসংযোগের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে। সরকারি কাজকর্মেও গণযোগাযোগের বহুলব্যবহার পরিলক্ষিত হচ্ছে। এদেশের সরকারি অফিস-আদালত প্রথম গণসংযোগ বিভাগ খোলা হয়েছে। এ বিভাগ প্রতিষ্ঠানের বাইরে ও ভেতরে বিভিন্ন বিষয়ে যোগাযোগ রক্ষা করেছে।

আমাদের দেশে বার্তা আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে গণসংযোগ উৎকৃষ্ট মাধ্যম হিসেবে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে একে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া একে পেশা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগ বিভাগ, নামে আলাদা বিভাগ খোলা হয়েছে। সরকারও সারা দেশকে একটি নেটওয়ার্কের আওতায় আনার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে এভাবে দিন দিন এটি বাংলাদেশে জনপ্রিয় হচ্ছে।

বাংলাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক সবক্ষেত্রেই গণসংযোগ পেশার বহুলব্যবহার দেখা যায়। যদিও বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর তুলনায় এখানকার গণসংযোগ ব্যবস্থা ততটা বিকাশ লাভ করতে পারে নি, তথাপি দিন দিন এ পেশার প্রসার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি তথা ব্যবসায়-বাণিজ্যের সম্প্রসারণের সাথে সাথে এর পরিধিও দিন দিন সম্প্রসারিত হচ্ছে। আমাদের দেশে রেডিও, টেলিভিশন, সিনেমা, ম্যাগাজিন, সংবাদপত্র ইত্যাদি দীর্ঘ দিন গণসংযোগের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছে। আর এস কর্মকাণ্ডে পেশাদার গণসংযোগ কর্মীদের মূল্যায়ন যথেষ্ট। আমাদের প্রতিটি সরকারি-বেসরকারি অফিসে, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গণসংযোগ বিষয়ের জন্য আলাদা বিভাগ রয়েছে।

এভাবে আমাদের দেশে গণসংযোগ পেশা দিন দিন জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। সরকারও সারা দেশকে একটি নেটওয়ার্কের আওতায় আনার জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে রেডিও এবং টেলিভিশনের উপকেন্দ্র ও রিলেকেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে। আশা করা যায়, ভবিষ্যতে আমাদের দেশে এ পেশার ব্যাপক উন্নতি ঘটবে এবং গণসংযোগের আধুনিক কলাকৌশল ব্যবহারের মাধ্যমে এটি একটি পরিপূর্ণ শিল্প হিসেবে গড়ে উঠবে।

অধ্যায়-০৯: প্রত্যক্ষ মার্কেটিং

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর

১। প্রত্যক্ষ মার্কেটিং কাকে বলে?

উত্তর: অতীতে মধ্যস্থকারবারি ব্যবহার করে দ্রব্য বা সেবা বাজারজাতকরণ করা হত। কিন্তু তথ্য ও যোগাযোগ পদ্ধতি উন্নয়নের ফলে প্রতিষ্ঠান মধ্যস্থকারবারি পরিহার করে প্রত্যক্ষভাবে ক্রেতা-ভোক্তার নিকট দ্রব্য বা সেবা পরিবেশনের কৌশল ব্যবহার করে। সাধারণত ডাক ও তার, মুদ্রণ কৌশল, ক্যাটালগ, ফ্যাক্স, ই-মেইল, ইন্টারনেটসহ অনলাইন সার্ভিস মাধ্যম ব্যবহার করে বর্তমানে দ্রব্য বা সেবা বিতরণ করা হয়। ফলে প্রতিষ্ঠান সহজে লক্ষ্য নির্ধারণ করে সফলতার সাথে বিক্রয়কার্য সম্পাদন করতে পারে।

Churchill & Peter-এর মতে, “ভোক্তাদের নিকট থেকে অর্ডার গ্রহণের জন্য ব্যক্তিগত বিক্রয় অথবা বিভিন্ন বিজ্ঞাপন মাধ্যমের সাহায্যে পরিচালিত মার্কেটিং প্রচেষ্টাকে প্রত্যক্ষ মার্কেটিং বলে।”

Philip Kotler & Armstrong-এর মতে, “তাৎক্ষণিক সাড়া প্রাপ্তি এবং দীর্ঘস্থায়ী গ্রাহক সম্পর্কে অনুশীলন করার জন্য সতর্কতার সাথে লক্ষ্যস্থিত প্রত্যেক গ্রাহকের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করাকে প্রত্যক্ষ মার্কেটিং বলে।”

সুতরাং, অনলাইন সার্ভিস এবং প্রত্যক্ষ যেসব পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রতিষ্ঠান মধ্যস্থকারবারি পরিহার করে দ্রব্য বা সেবা বাজারে পরিবেশন করে, তাকে প্রত্যক্ষ এবং অনলাইন সার্ভিস বলে।

২। টেলিমার্কেটিং কাকে বলে?

উত্তর: টেলিফোন অপারেটর ব্যবহার করে নতুন ক্রেতা আকর্ষণ, বর্তমান ক্রেতা সন্তুষ্টি নিরূপণ এবং ফরমায়েশ গ্রহণ করাকে টেলিমার্কেটিং বলে। অর্থাৎ, যে ব্যবস্থায় বিক্রয়কর্মী দোকানদারদের সাথে প্রাথমিক যোগাযোগ স্থাপন করে টেলিফোনের মাধ্যমে বিক্রয়কার্য সম্পাদন করে, তাকে টেলিমার্কেটিং বলে।

এমএ দৌলা-এর মতে, “টেলিফোনের মাধ্যমে ক্রেতা সন্তুষ্টি নিরূপণ ও ফরমায়েশ গ্রহণ করাকে টেলিমার্কেটিং বলে।”

সাধারণত সংক্ষিপ্ত ফরমায়েশ গ্রহণের ক্ষেত্রে টেলিফোন ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে অনেক ক্রেতা-ভোক্তা টেলিফোনে দ্রব্য ও সেবার ফরমায়েশ প্রদান করে থাকে। তবে সাম্প্রতিককালে টেলিফোনের মাধ্যমে হোম ব্যাংকিং চালু হয়েছে। এ পদ্ধতিতে স্বয়ংক্রিয় ডায়াল এবং ধারণা বার্তা যন্ত্রের সাহায্যে বার্তা প্রেরণ করে উত্তর রেকর্ডকরণ যন্ত্রের সাহায্যে আগ্রহী ক্রেতার ফরমায়েশ গ্রহণ করা হয়। এতে ফরমায়েশ অনুযায়ী দ্রব্য ও সেবা প্রেরণ করে প্রতিষ্ঠান সহজে বিক্রয়কার্য সম্পাদন করতে পারে।

৩। ই-কমার্স বা ইলেকট্রনিক্স কমার্স কাকে বলে?

উত্তর: অতীতে মধ্যস্থকারবারি ব্যবহার করে দ্রব্য বা সেবা বাজারজাত করা হত। কিন্তু তথ্য ও যোগাযোগ পদ্ধতি উন্নয়নের ফলে প্রতিষ্ঠান মধ্যস্থকারবারি পরিহার করে প্রত্যক্ষভাবে ক্রেতা-ভোক্তার নিকট দ্রব্য ও সেবা পরিবেশনের কৌশল ব্যবহার করে থাকে। সাধারণত ডাক ও তার, মুদ্রণ কৌশল, ক্যাটালগ, ফ্যাক্স, ই-মেইল, ইন্টারনেটসহ অন-লাইন সার্ভিস মাধ্যম ব্যবহার করে বর্তমানে দ্রব্য ও সেবা বিতরণ করা হয়। ফলে প্রতিষ্ঠান সহজে লক্ষ্য নির্ধারণ করে সফলতার সাথে বিক্রয়কার্য সম্পাদন করতে পারে।

এম. এ দৌলার মতে, “মডেমের সাহায্যে অর্ডার গ্রহণসহ পণ্য সম্পর্কিত তথ্য কম্পিউটারের মাধ্যমে প্রদর্শনকে অন-লাইন মার্কেটিং বলে।”

সুতরাং, অন-লাইন সার্ভিস এবং প্রত্যক্ষ যে সকল পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রতিষ্ঠান মধ্যস্থকারবারি পরিহার করে দ্রব্য ও সেবা বাজারে পরিবেশন করে, তাকে প্রত্যক্ষ এবং অন-লাইন মার্কেটিং বলে। অন-লাইন বাজারজাতকরণ কম্পিউটারের সাহায্যে ক্রেতা-বিক্রেতার মাধ্যমে ইলেকট্রনিক উপায়ে যোগাযোগ করা হলে তাকে অন-লাইন বাজারজাতকরণ বলে।

রচনামূলক প্রশ্ন উত্তর

১। প্রত্যক্ষ মার্কেটিং বা বাজারজাতকরণের সুবিধাসমূহ আলোচনা কর।

প্রত্যক্ষ মার্কেটিং-এর সুবিধাসমূহ: নিচে প্রত্যক্ষ মার্কেটিং সুবিধাসমূহ আলোচনা করা হলো:-

ক. ক্রেতাদের সুবিধা:

১। সুবিধাজনক ক্রয়: প্রত্যক্ষ মার্কেটিং-এ ক্রেতাদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে তাদের ঘরে পণ্য বা সেবা সরবরাহ করা হয়। এতে চলাচলের প্রতিবন্ধকতা, গাড়ি পার্কিং-এর অসুবিধা ইত্যাদি সমস্যার সমাধান করা হয়। এতে ক্রেতা সুবিধাজনক পণ্য ক্রয় করতে পারে।

২। সহজ এবং ব্যক্তিগত ক্রয়: প্রত্যক্ষ মার্কেটিং/বাজারজাতকরণে বিক্রেতাদের মুখোমুখি উদ্ধৃতিকরণ ও আবেগপ্রসূত কার্যক্রম হতে গ্রাহক বিরত থাকে। এতে পণ্য ক্রয়ে ক্রেতাদের কোন ঝামেলা পোহাতে হয় না। তা ছাড়া এ ব্যবস্থায় বিক্রয়কর্মীর সহায়তা ছাড়া পণ্য বা সেবা সম্পর্কে গ্রাহক অবগত হতে পারে।

৩। পণ্যসম্ভার এবং নির্বাচন: প্রত্যক্ষ মার্কেটিং দোকানদারদের বৃহৎ পণ্যসম্ভারের তথ্য সংরক্ষণ করে। ফলে বিভিন্ন ধরনের পণ্য হতে গ্রাহক সহজে প্রয়োজনীয় পণ্য নির্বাচন করতে পারে।

৪। তুলনামূলক তথ্য লাভ: এ ব্যবস্থায় অন-লাইন এবং ইন্টারনেট চ্যানেলের গ্রাহক কোম্পানি এবং প্রতিযোগী সম্পর্কে তথ্য লাভ করতে পারে। অন-লাইন এবং ইন্টারনেট চ্যানেল গ্রাহকদের সমৃদ্ধ তুলনামূলক তথ্যে প্রবেশ করতে দেয়। এতে অনেক সময় মাঝে মাঝে সাধারণত বিভিন্ন কোম্পানির পক্ষে সহজে বিক্রেতা বা উৎপাদন নির্বাচন করা সম্ভবপর হয়।

(খ) বিক্রেতাদের সুবিধা: অনেক সময় প্রত্যক্ষ মার্কেটিং/বাজারজাতকরণ বিক্রেতাদের বিবিধ সুবিধা প্রদান করে থাকে, যথা-

১। গ্রাহক সম্পর্ক সৃষ্টি: মুনাফাযোগ্য সম্ভাব্য গ্রাহক সম্পর্কে প্রত্যক্ষ বাজারজাতকারী বিস্তারিত তথ্যবাহিত উপাত্ত ভাণ্ডার সৃষ্টি বা ক্রয় করে। ফলে উপাত্ত ভাণ্ডার হতে গ্রাহক সহজে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। এতে বিক্রেতার সাথে ক্রেতার গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি হয়।

২। কারিগরি সুবিধা: প্রত্যক্ষ বাজারজাতকরণ ক্রেতাদের ক্ষুদ্র দল বা কোন ব্যক্তিগত ক্রেতাকে নির্বাচন করে তাদের সাথে যোগাযোগ করে। ফলে প্রযুক্তিগত সুবিধা প্রদান করে ক্রেতাদের বিশেষ প্রয়োজন বা চাহিদা পূরণ করা সম্ভবপর হয়।

৩। বিকল্প মাধ্যম ও সংবাদ পরীক্ষা: প্রত্যক্ষ বাজারজাতকরণ সর্বোত্তম সময়ে অধিকতর আগ্রহী গ্রাহকের নিকট পৌঁছে। এতে অধিকতর পাঠক এবং প্রতিক্রিয়া পাওয়া সম্ভবপর হয়। ফলে বিভিন্ন বিকল্প মাধ্যম ও সংবাদ সহজে পরীক্ষা করা সম্ভবপর হয়।

৪। গ্রাহক ভ্যালু এবং সন্তুষ্টি বৃদ্ধি: সাধারণত প্রত্যক্ষ বাজারজাতকরণ আন্তঃপ্রকৃতির। তাই এ ব্যবস্থায় গ্রাহকদের অভাব এবং প্রয়োজন জানার জন্য অন-লাইনে যোগাযোগ করা হয়। অর্থাৎ, এ ব্যবস্থায় গ্রাহকদের অন-লাইনে প্রশ্ন করে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত প্রতিউত্তর পাওয়া যায়। এতে পণ্য ও সেবা সংশোধন করে প্রতিষ্ঠান গ্রাহক ভ্যালু ও সন্তুষ্টি বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়।

৫। ব্যয় হ্রাস: প্রত্যক্ষ বাজারজাতকরণ গুদামঘর সংরক্ষণ, ভাড়া, বীমা এবং উপযোগিতা ব্যয় পরিহার করতে পারে। তা ছাড়া এ ব্যবস্থায় ইন্টারনেটসহ অন্যান্য ইলেকট্রনিক চ্যানেল ব্যবহার করে কার্যসম্পাদন করা হয়। এতে বাজারজাতকরণ ব্যয় হ্রাস পায়।

(গ) প্রত্যক্ষ বাজারজাতকরণের প্রবৃদ্ধি : গতানুগতিক প্রত্যক্ষ বাজারজাতকরণ ব্যবস্থায় টেলিফোন, সরাসরি ডাক, ক্যাটালগ, সরাসরি প্রতিক্রিয়া, টেলিভিশন এবং অন্যান্য কিছু মাধ্যম দ্রুত প্রবৃদ্ধি লাভ করে। নিম্নে প্রত্যক্ষ বাজারজাতকরণে অন-লাইনের প্রবৃদ্ধির কারণ উপস্থাপন করা হল :

১। ব্যয়: ভোক্তা বাজারে প্রত্যক্ষ বাজারজাতকরণের প্রবৃদ্ধির অন্যতম কারণ ব্যয়। সাধারণত অন-লাইনে ফ্রি টেলিফোনে কথা বলে যে কোন সময়ে গ্রাহক ফরমায়েশ প্রদান করতে পারে। এমতাবস্থায় গ্রাহক ঘরে বসে প্রত্যাশিত পণ্য পেতে পারে। এতে প্রত্যক্ষ বাজারজাতকরণ দ্রুত প্রবৃদ্ধি লাভ করে।

২। ব্যবসায়-টু-ব্যবসায় বাজারজাতকরণ: প্রত্যক্ষ বাজারজাতকরণে বিক্রেতা গ্রাহকের ফরমায়েশের প্রতি সাড়া দান করে নিজস্ব বিক্রয় বাহিনী নিয়োগ করে পণ্য পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করে। এতে কম খরচে অধিকতর সম্ভাব্য ক্রেতা এবং গ্রাহকের নিকট পণ্য পৌঁছে দেয়া সম্ভবপর হয়। ফলে অনেক সময় সাধারণত প্রত্যক্ষ মার্কেটিং বা বাজারজাতকরণের প্রবৃদ্ধি ঘটে।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, বাজারজাতকরণের একটি নতুন পদ্ধতি হচ্ছে প্রত্যক্ষ মার্কেটিং। এ ব্যবস্থায় আধুনিক প্রযুক্তি ও কলাকৌশল ব্যবহার করে দ্রুত ক্রেতার প্রতি সাড়া দানের ব্যবস্থা করা হয়। এতে গ্রাহক ঘরে বসে ন্যূনতম খরচে প্রত্যাশিত পণ্য ও সেবা লাভ করতে সক্ষম হয়।

২। প্রত্যক্ষ মার্কেটিং বা বাজারজাতকরণের অসুবিধাসমূহ আলোচনা কর।

উত্তর: ভূমিকা : অতীতে মধ্যস্থকারবারি ব্যবহার করে দ্রব্য বা সেবা বাজারজাতকরণ করা হত। কিন্তু তথ্য ও যোগাযোগ পদ্ধতি উন্নয়নের ফলে প্রতিষ্ঠান মধ্যস্থকারবারি পরিহার করে প্রত্যক্ষভাবে ক্রেতা-ভোক্তার নিকট দ্রব্য বা সেবা পরিবেশনের কৌশল ব্যবহার করে। সাধারণত ডাক ও তার, মুদ্রণ কৌশল, ক্যাটালগ, ফ্যাক্স, ই-মেইল, ইন্টারনেটসহ অন-লাইন সার্ভিস মাধ্যম ব্যবহার করে বর্তমানে দ্রব্য বা সেবা বিতরণ করা হয়। ফলে প্রতিষ্ঠান সহজে লক্ষ্য নির্ধারণ করে সফলতার সাথে বিক্রয়কার্য সম্পাদন করতে পারে। সুতরাং, অন-লাইন সার্ভিস এবং প্রত্যক্ষ যেসব পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রতিষ্ঠান মধ্যস্থকারবারি পরিহার করে দ্রব্য বা সেবা বাজারে পরিবেশন করে, তাকে প্রত্যক্ষ এবং অন-লাইন সার্ভিস বলে।

প্রত্যক্ষ মার্কেটিং এর অসুবিধাসমূহ : প্রত্যক্ষ মার্কেটিং এর সুবিধার পাশাপাশি বেশ কিছু অসুবিধা আছে। নিম্নে প্রত্যক্ষ মার্কেটিং এর অসুবিধাসমূহ উল্লেখ করা হল-

১। প্রত্যক্ষ মার্কেটিং এর অন্যতম অসুবিধা হল অনেকসময় প্রত্যক্ষ মার্কেটিং-এর আশ্রয় নিলে ইচ্ছেমতো বাজারের পরিধি সম্প্রসারণ করা যায় না। উৎপাদক বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে দেশের সর্বত্র বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন করতে পারে না।

২। এর আর একটি অসুবিধা হল কর্মীবাহিনী পরিচালনায়ও সমস্যা দেখা দিতে পারে। বিভিন্ন শহরে/গ্রামাঞ্চলের বাজারে অবস্থিত বিক্রয়কেন্দ্রে নিযুক্ত কর্মীদেরকে সঠিকভাবে পরিচালনা করা সহজ কথা নয়।

৩। এ ধরনের মার্কেটিং এর ক্ষেত্রে আলাদা বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন করা অপরিহার্য। এরূপ বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন করার জন্য প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন।

৪। প্রত্যক্ষ মার্কেটিং-এর মধ্যস্থকারবারির (যেমন, পাইকার/ডিলার ইত্যাদি) সাহায্য নেয়া হয় না বলে উৎপাদককে বিপুল পরিমাণ পণ্য গুদামে মজুদ রাখতে হয়। এতে একদিকে গুদাম ঘরের জন্য এবং অন্যদিকে মজুদমাল সংরক্ষিত রাখার কারণে প্রচুর পুঁজি আটকা পড়ে থাকে।

৫। প্রত্যক্ষ মার্কেটিং এর আর একটি বিশেষ অসুবিধা হল এ ধরনের মার্কেটিং-এ নিজস্ব দোকানের মাধ্যমে পণ্য বিক্রি করতে হয় বলে ধীরগতিতে বিক্রয়কার্য সম্পন্ন হয়। ফলে উৎপাদিত পণ্যে ব্যয়কৃত পুঁজি ওঠে আসতে অধিক সময় লাগে।

৬। অনেকগুলো বিক্রয়কেন্দ্র খুলতে হয় বিধায় বিপুলসংখ্যক কর্মীবাহিনী নিয়োগ করার প্রয়োজন হয়। এদের প্রশিক্ষণ দান, পরিচালনা ও বেতন ভাতা বাবদ অর্থ ব্যয় করতে হয়। এতে ব্যবসায়ের উপর আর্থিক চাপ পড়ে।

৭। এর আর একটি অসুবিধা হল প্রত্যক্ষ মার্কেটিং বা বাজারজাতকরণ ব্যবস্থায় উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপকদেরকে বিক্রয় কার্য পরিচালনায় অনেক সময় দিতে হয়। এতে উৎপাদন কার্যে অধিকতর মনোযোগ দেয়ার সুযোগ কমে যায়। ফলে উৎপাদনের উপর বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে।

৮। এ ধরনের মার্কেটিং এ ভোক্তা/ব্যবহারকারীরাও কিছু সমস্যার সম্মুখীন হয়। উৎপাদক থেকে ভোক্তার দূরত্ব বেশি হলে ভোক্তাকে পরিবহন খরচ বেশি দিতে হয়। এছাড়া বিক্রয়কেন্দ্রে শুধু একজন উৎপাদকের পণ্য থাকার কারণে ক্রেতা পণ্য যাচাই করতে পারে না।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, উপরোল্লিখিত কারণে প্রত্যক্ষ মার্কেটিং-এ কখনো কখনো বিভিন্ন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়।

৩। অনলাইন মার্কেটিং বা বাজারজাতকরণের জনপ্রিয়তার কারণ আলোচনা কর।

উত্তর: বর্তমানে মার্কেটিং বা বাজারজাতকরণের অন্যতম একটি মাধ্যম হচ্ছে অন-লাইন মার্কেটিং বা বাজারজাতকরণ। সাধারণত ঘরে বসে দেশের অভ্যন্তরে বা বহির্বিদেশে যোগাযোগ রক্ষা করে অন-লাইন সার্ভিস ক্রেতা-ভোক্তাদের নিকট দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করছে। অন-লাইনের জনপ্রিয়তা নৈপথ্যে অনেকগুলো কারণ জড়িত। নিচে অন-লাইন সার্ভিসের জনপ্রিয়তার কারণসমূহ বর্ণনা করা হলো :

১. ঝামেলা পরিহার: অন-লাইন সার্ভিস ব্যবহার করলে দ্রব্য ও সেবা বিক্রয়ে পৃথক বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন হয় না। তাছাড়া এ ব্যবস্থায় স্বশরীরে বিক্রয়স্থলে উপস্থিত হয়ে দ্রব্য ক্রয়ের প্রয়োজন পড়ে না। এতে ঝামেলামুক্ত পরিবেশে ক্রেতা দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করতে পারে।

২. পর্যাপ্ত তথ্য লাভ: অন-লাইন সার্ভিসের ইন্টারনেট ব্যবহার করে ক্রেতা সমজাতীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পর্যাপ্ত তথ্য লাভ করতে পারে। এসব তথ্য বিচার-বিশ্লেষণ করে ক্রেতা দ্রব্য সরবরাহের আদেশ দেয়। ফলে ক্রেতার পক্ষে ন্যায্য মূল্যে দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করা সম্ভবপর হয়।

৩. ফরমায়েশ দান: অন-লাইন "সার্ভিসের মাধ্যমে ক্রেতা-ভোক্তা যে কোনো স্থানে বসে দ্রব্য ক্রয়ের ফরমায়েশ প্রদান করতে পারে। এক্ষেত্রে ফরমায়েশ পাওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বিক্রেতা, ক্রেতার নির্ধারিত স্থানে দ্রব্য সরবরাহ করে। ফলে কোনোরূপ বাড়তি ঝামেলা ছাড়া ক্রেতা সময়মতো দ্রব্য ক্রয় করতে সক্ষম হয়।

৪. বাজার ব্যবস্থায় দ্রুত সমন্বয়সাধন: এ ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠান দ্রুত ফরমায়েশকৃত দ্রব্য সংগ্রহ করে বাজারজাত করতে পারে। তাছাড়া অন-লাইন সার্ভিস ব্যবস্থায় পরিবর্তিত বাজার ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠান সহজে দ্রব্যের ধরন ও মূল্য পরিবর্তন করতে পারে। এতে সাধারণত বাজারজাতকরণ বাজার ব্যবস্থার দ্রুত সমন্বয়সাধন করা সম্ভবপর হয়।

৫. ব্যয় হ্রাস: অন-লাইন সার্ভিসে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয় কার্য সম্পাদিত হয়। এমতাবস্থায় পৃথক কোনো দোকান ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় না। ফলে দোকান ভাড়া, রক্ষণাবেক্ষণ, বীমা ও বিভিন্ন উপযোগ বা সেবা পরিহার করা সম্ভব হয়। এতে প্রতিষ্ঠানের বিপণন ব্যয় হ্রাস পায়।

৬. ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে সুসম্পর্ক সৃষ্টি: প্রতিষ্ঠান অন-লাইন ব্যবহারের মাধ্যমে ক্রেতা-ভোক্তাদের সাথে কথোপকথনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান তাদের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারে। তাছাড়া এ ব্যবস্থায় ইন্টারনেট থেকে ক্রেতাদের বিভিন্ন তথ্য বিক্রেতা ডাউনলোড করে নিতে পারে। ফলে সময় সময় ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়।

৭. ডেলিভারি ও বিজ্ঞাপনের মান বৃদ্ধি: অন-লাইনের মাধ্যমে বহুসংখ্যক লোক তথ্য সম্পর্কে অবগত হয়। কিন্তু সকলে একসাথে ফরমায়েশ প্রদান করে না। তবে এ ব্যবস্থায় অন-লাইনে প্রবেশকারীদের সম্পর্কে প্রতিষ্ঠান তথ্য লাভ করতে পারে। ফলে প্রতিষ্ঠানের পক্ষে দ্রব্য ও সেবার ডেলিভারি এবং বিজ্ঞাপনের মান বৃদ্ধি করা সম্ভবপর হয়।

উপরিউক্ত আলোচনায় বলা যায়, অন-লাইন ব্যবহার করে প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সুবিধা লাভ করতে পারে। তাছাড়া অন-লাইন ব্যবহার করে বহনযোগ্য খরচ, বিজ্ঞাপনের অসীম স্থান ব্যবহার, দ্রুত তথ্য আদান- প্রদান, সহজে প্রবেশ, গোপনীয়ভাবে দ্রুত ক্রয়-বিক্রয় কার্যসম্পাদন ইত্যাদি সুবিধা লাভ করা যেতে পারে।

অধ্যায়-১০: মার্কেটিং প্ল্যান

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর

১। মার্কেটিং প্ল্যান কাকে বলে?

উত্তর: সাধারণভাবে প্ল্যান বা পরিকল্পনা বলতে বুঝায় ভবিষ্যতে কী করা হবে, কীভাবে করা হবে সে সম্পর্কে অগ্রিম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। আর মার্কেটিং বা বাজারজাতকরণের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অবস্থার চিত্র তুলে ধরা হয় যে প্রতিবেদনের মাধ্যমে, তাকে মার্কেটিং প্ল্যান বা বাজারজাতকরণ পরিকল্পনা বলে। একে প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনা, ঋণ প্রস্তাব, বিনিয়োগ প্রসপেক্টাস ইত্যাদিও বলা হয়। নিম্নে মার্কেটিং প্ল্যানের বা বাজারজাতকরণ পরিকল্পনার সংজ্ঞা দেওয়া হল-

ফিলিপ কটলার-এর মতে, “যে প্রতিবেদন হতে বাজারজাতকরণের ভবিষ্যৎ করণীয় বিষয় ও সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়, যা ব্যবসায়ের সফলতা অর্জনে দিক নির্দেশনা হিসেবে কাজ করে, তাকে মার্কেটিং প্ল্যান বলে।”

এম. এ. দৌলা-এর মতে, “মার্কেটিং প্ল্যান হলো তথ্যসমূহের কঠোর নিয়মতান্ত্রিক ব্যবহার, যা কোন সফল উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি হিসাবে কাজ করে।”

রচনামূলক প্রশ্ন উত্তর

১। মার্কেটিং প্ল্যানের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।

উত্তর: মার্কেটিং প্ল্যান বা বাজারজাতকরণ পরিকল্পনার গুরুত্ব : নিম্নে মার্কেটিং প্ল্যান এর গুরুত্ব আলোচনা করা হল-

১। কোম্পানির মিশন সংজ্ঞায়ন : প্রকৃতপক্ষে কৌশলগত পরিকল্পনা কোম্পানির মিশন সংজ্ঞায়নে সহায়তা করে।

২। কৌশল প্রণয়ন : এক্ষেত্রে পূর্বনির্ধারিত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কোম্পানিকে কৌশল প্রণয়ন করতে হয়। কৌশলগত পরিকল্পন পরিষ্টিত অনুযায়ী কৌশল প্রণয়ন সাহায্য করে। এতে প্রতিষ্ঠান সাফল্যের সাথে টিকে থাকতে পারে।

৩। উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি নির্ধারণ : মূলত কৌশলগত পরিকল্পনা কোম্পানির দীর্ঘমেয়াদি উদ্দেশ্য নির্ধারণ এবং উক্ত উদ্দেশ্য কীভাবে অর্জিত হবে তার কর্মপদ্ধতি নির্ধারণে সহায়তা করে। প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করে।

৪। ব্যবসায় খাত নির্ধারণ: কোম্পানির ব্যবসায় খাতগুলো নির্ধারণে কৌশলগত পরিকল্পনা সহায়তা করে। ব্যবসায় খাতগুলো নির্ধারিত হলে প্রতিটি ব্যবসায় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা কোম্পানির জন্য সহজ হয়।

৫। ব্যবসায় খাত বিশ্লেষণ : কোম্পানির ব্যবসায় খাত বিশ্লেষণে কৌশলগত পরিকল্পনা সহায়তা করে। ব্যবসায় খাতগুলো বিশ্লেষণের মাধ্যমে কোম্পানি কোন খাতে বেশি বিনিয়োগ করবে, কোন খাতে কম বিনিয়োগ করবে এবং কোন খাতে বিনিয়োগ করবে না তা জানতে পারে।

৬। মডেলভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ : মডেলভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে কৌশলগত পরিকল্পনা সহায়তা করে।

৭। গ্যাপ চিহ্নিতকরণ ও পূরণ : কৌশলগত পরিকল্পনার মাধ্যমে কোম্পানির ভবিষ্যৎ বিক্রয় ও প্রাক্কলনকৃত বর্তমান বিক্রয়ের মধ্যে গ্যাপ চিহ্নিত করে তা পূরণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

৮। সবলতা ও দুর্বলতা নির্ধারণ : কোম্পানির সবলতা ও দুর্বলতা নির্ধারণে কৌশলগত পরিকল্পনা সহায়তা করে। সবলতা ও দুর্বলতা নির্ধারণ করতে পারলে কোম্পানির পক্ষে কার্যক্রম পরিচালনা করা সহজ হবে।

৯। সামঞ্জস্যপূর্ণ দিক নির্দেশনা প্রদান : কৌশলগত পরিকল্পনা সামঞ্জস্যপূর্ণ দিক নির্দেশনা প্রদান করে। এর ফলে মিতব্যয়িতা অর্জন ও দক্ষভাবে কার্য সম্পাদন সম্ভব হয়।

১০। মুনাফার পরিমাণ নির্ধারণ : কৌশলগত পরিকল্পনা কোম্পানির মুনাফার পরিমাণ নির্ধারণে সহায়তা করে। এর ফলে বিনিয়োগের উপর রিটার্নের পরিমাণ কত হবে তা জানা যায়।

১১। সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ : তথ্য বিশ্লেষণ করে সঠিক সিদ্ধান্ত কৌশলগত পরিকল্পনার মাধ্যমে গ্রহণ করা যায়। এর ফলে কোম্পানি সফলতা অর্জন করতে পারে।

পরিশেষে বলা যায়, উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে মার্কেটিং প্ল্যান বা বাজারজাতকরণ পরিকল্পনা সম্পর্কে বিশদভাবে এবং সঠিকরূপে আমরা জানতে পারি।

নিয়মিত আপডেট পেতে **HSC BMT** ইউটিউব চ্যানেলটি সাবক্রাইব করে বেল বাটন বাজিয়ে রাখুন

এই সাজেশনটি “HSC BMT/এইচএসসি বিএমটি”
ইউটিউব চ্যানেল ব্যতীত অন্য কোন চ্যানেল বা পেইজ
থেকে নিলে আপনি প্রভাবিত হতে পারেন।